সত্যের সন্ধানে

সংকলনে

জুয়েল বড়ুয়া

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Suvabito Bhante

সত্যের সন্ধানে

বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃর্জাগরণের অগ্রদূত, সিলেটে সর্বপ্রথম ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান পালনকারী এবং সর্বপ্রথম কঠিন চীবর দানের প্রবর্ত্তক, বহু মূল্যবান ধর্মীয় গ্রন্থের সম্পাদক ও লেখক উদীয়মান সাংঘিক ব্যক্তিত্ব **ভদন্ত বিপুলবংশ ভিক্ষু** মহোদয়ের ভূমিকা সম্বলিত।

সংকলনে

জুয়েল বড়ুয়া

সত্যের সন্ধানে

সংকলক ঃ
জুয়েল বড়ুয়া

প্রকাশক ঃ
বাবু কাজল বড়ুয়া
মধ্যম বিনাজুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রকাশ কাল ঃ
২৫৫২ বুদ্ধাব্দ।
১রা বৈশাখ ১৪১৬ বাংল।
১৪ এপিল ২০০৯ ইংরেজী।

© সংকলক কর্তৃক সবস্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে ঃ
ওসাকা আর্ট প্রেস
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩১০৮৯

শ্রদ্ধাদান ঃ ৫০ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

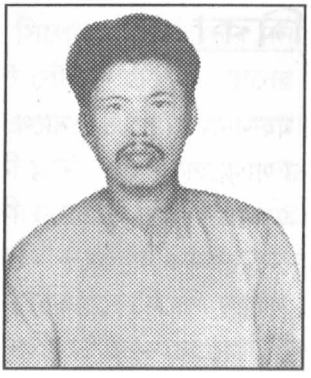

প্রয়াত বাবা শ্রীবৎস বড়ুয়া

এবং

মা বিধু বালা বড়ুয়া'র

পুণ্যময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত

প্রকাশক

কাজল বড়ুয়া

প্রয়াত দাদু অমৃত লাল বড়ুয়া

এবং

প্রয়াতা ঠাকুরমা নীহার প্রভা বড়ুয়া

সংকলক

জুয়েল বড়ুয়া

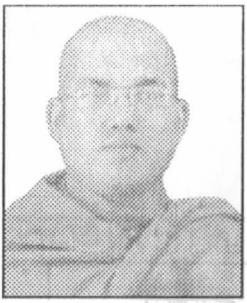

ভূমিকা

২০০৮ এর শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে বৌদ্ধ প্রতিনিধি হিসেবে আমার একটা সৌজন্য সাক্ষাৎকার ছিল। কিন্তু সিলেট বিভাগে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদের একমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সিলেট বৌদ্ধ বিহারে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার গুরুভন্তেকে ফাং করেন সিলেট বৌদ্ধ সমিতির সদস্যবৃন্দ। গুরুভন্তে আর একটা জরুরী কাজের জন্য উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারছেনা বিধায় আমাকে নির্দেশ করে সিলেটের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমার সাথে প্রিয়ভাজন শ্রদ্ধাপাল ভিক্ষুসহ আরো কয়েকজন ভিক্ষু ছিল। তাই মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে আর অংশগ্রহণ হলো না। আমরা ১৮ মে সকাল ৮টায় সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি, বিকাল ৫টায় পৌঁছলাম। পরের দিন ১৯ মে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা। সেদিন সবে মাত্র পূর্ব গগণে সূর্য উদিত হল। ঠিক সে মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে শ্রদ্ধেয় তিলোকাবংশ স্থবির মহোদয় আমার সেল্ ফোনে কল করে জানাল, গুরুভন্তে ও তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সিলেট বৌদ্ধ বিহারের প্রথম অধ্যক্ষ দীপানন্দ ভিক্ষুকে বিশেষ প্রয়োজনে চট্টগ্রামে নিয়ে আসবে তার পরিবর্তে আমাকে সিলেট বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিতে হবে। সেল্ ফোনে তিলোকাবংশ ভন্তের নম্বর প্রথমে দেখে আমি মনে করেছিলাম, তিনি হয়তো শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য কল করলো। কিন্তু হলো বিধি বাম। হঠাৎ এরকম একটি সিদ্ধান্ত শুনে প্রচণ্ড মানসিক কষ্ট অনুভব করলাম। তারপরও গুরুভন্তে ও তিলোকাবংশ ভন্তের এই সিদ্ধান্তটা মেনে নিলাম। পরবর্তীতে সিলেট বৌদ্ধ সমিতির কর্মকর্তাদের সাথে তিলোকাবংশ ভন্তের প্রস্তাব নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ আলোচনা হয়। তারাও কিছুটা মর্মাহত হয়, তাদের বিহারের প্রথম অধ্যক্ষ

মহোদয়কে হঠাৎ করে চট্টগ্রামে ফেরত নেয়ার কারণে। দিপানন্দ ভিক্ষুরও একান্ত ইচ্ছা ছিল অন্ততঃপক্ষে একটি বর্ষাবাস সিলেটে অবস্থান করবেন। সে যাত্রায় বুদ্ধ পূর্ণিমা অনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমার আবাসস্থল মোগলটুলী শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহারে চলে আসি। পুনরায় ৩১ মে সিলেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ১ জুন থেকে সিলেট বৌদ্ধ বিহারে আমার দায়িত্ব পালন শুরু হয়। ১ জুন থেকে ১ নভেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত আমি সিলেট বৌদ্ধ বিহারে নিয়মিত অবস্থান করি। দীর্ঘ এই ৫ মাস সিলেট বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানের সময় বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকাণ্ড ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সেভ দি চিলড্রেন – ইউএসএ'র সহযোগিতায় পদক্ষেপ কনসোর্টিয়াম কর্তৃক আয়োজিত এইসআইভি এবং এইডস প্রতিরোধ বিষয়ক বেশ কয়েকটি কর্মশালায় বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করি। উক্ত কর্মশালা গুলোতে সিলেট বিভাগের সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপার, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ধর্মীয় গুরু, বিভিন্ন এজিও প্রতিনিধি, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকতেন। আমি বৌদ্ধ ধর্মের আলোকে এইসআইভি এবং এইডস প্রতিরোধের উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করি। হবিগঞ্জ দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত "দুর্নীতি প্রতিরোধে আন্তঃ ধর্মীয় সম্মেলন-০৮" বিশেষ অতিথি হিসেবে আমি উপস্থিত ছিলাম। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরী। উক্ত সম্মেলনে ব্যবহারিক জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের নিয়ম-নীতি প্রতিপালন করে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনের উপর জোর বক্তব্য প্রদান করি। ইস্‌কন কর্তৃক আয়োজিত শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করি। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ শীর্ষক প্রকল্প এর সিলেট বিভাগীয় আন্তঃ ধর্মীয় সংলাপ–২০০৮ এর মধ্যে আমি আদর্শ পরিবার গঠনের ধর্মীয় নির্দেশনার উপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করি। উক্ত সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার ড. জাফর আহমেদ খান। উক্ত সংলাপে ইসলাম ধর্মের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. আবদুর আউয়াল বিশ্বাস সহযোগী অধ্যাপক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

হিন্দু ধর্মের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর নিখিল ভট্টাচার্য্য অধ্যক্ষ (অবঃ) সরকারী কলেজ । খ্রিস্ট ধর্মের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সেলেস্টিন শিশির ম্রি এরিয়া ম্যানেজার কারিতাস সিলেট। এভাবেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে আমার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছি সিলেট অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে। সিলেট অঞ্চলে এখনো শতকরা ৯০% লোক জানেনা বৌদ্ধ ধর্ম কি? এবং বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর আদি নিবাস কোথায় ।

ঐতিহাসিক ভিত্তি মতে সিলেট অঞ্চলে বহু শতাব্দী পূর্বে বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তারা ছিল মহাযান মতবাদী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী। ১২২৭ মঘাব্দে আকিয়াব হতে সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির মহোদয়ের আগমনের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার হয়। বর্তমানে ১৩৭১ মঘাব্দ চলমান। ১২২৭ মঘাব্দ হতে বিগত ১৩৭০ মঘাব্দের হিসাব মতে ১৪৫ বছর পর আমিই সর্বপ্রথম থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে সিলেট অঞ্চলে ২০০৮ সালে ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত অধিষ্ঠান করি এবং তারই ফলশ্রুতিতে সর্বপ্রথম শুভ কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠিত হয়। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমার আগে এভাবে আর কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু সিলেট অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেনি।

সত্যের সন্ধানে বই এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে সিলেট বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানের সময় আমার ব্যক্তিগত কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরলাম। হয়তো পাঠকগণ কিছুটা বিরক্তবোধ করতে পারেন, তার জন্য দুঃখিত।

সিলেট বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানের সময় প্রিয়ভাজন জুয়েল বড়ুয়ার সাথে আমার পরিচয়। জুয়েলই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বিহার থেকে দেড় কিলোমিটারের এলাকার ভিতরে অবস্থান করে। বাকিরা প্রায় ৭/৮ কিলোমিটার এর বাহিরের অবস্থান করে। সে সুবাদে প্রায় সময় জুয়েল বিহারে এসে আমাদেরকে সঙ্গ দিত এবং ধর্ম ও দর্শন নিয়ে আমাদের প্রাণবন্ত আলাপ হত। সে পড়াশোনা করত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগে। আমি লক্ষ্য করলাম বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানার তার খুব আগ্রহ। শুধু আগ্রহ আছে বল্‌লে হয়তো খাটো করা হবে, সে একজন গবেষকও বটে। ইংরেজী ও বাংলায় ভাষায় প্রকাশিত প্রচুর ধর্মীয় বই সে পড়ে এবং পঠিত জ্ঞানের আলোকে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। সিলেটে একাকী অবস্থানকালীন

সময়ের একান্ত শুভানুধ্যায়ী প্রিয়ভাজন জুয়েল অনুরোধ করে বসল তার সংকলিত সত্যের সন্ধানে বইটির আমি যেন একটা ভূমিকা লিখি। আমার জানামতে ভূমিকা হচ্ছে একটি বই এর প্রাণ। আমার মত শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ভূমিকা দেওয়া অর্থ জুয়েল যে আমার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত সেটার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

সত্যের সন্ধানের গ্রন্থটি মূলতঃ তিনটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে সংকলিত। "গৌতম বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্ত" রাহুল সাংকৃতায়নের 'বৌদ্ধ দর্শন' বই হতে "মন এবং প্রকৃতি" পি জ্ঞানরামার 'এসেনসিয়াল অব বুড্ডিজম' নামক ইংরেজী গ্রন্থ হতে অনুদিত এবং "পঞ্চশীল" ডাঃ অন্নদাচরণ বড়ুয়ার গ্রন্থ হতে সংগৃহীত।

গৌতম বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত প্রবন্ধটির মূল বিষয়বস্তু-

(১) ঈশ্বরকে স্বীকার না করা ; মানুষ নিজেই নিজের প্রভু এই সিদ্ধান্তের বিরোধ হবে।

(২) আত্মাকে নিত্য বলে স্বীকার না করা; নতুবা এটির পরিশুদ্ধি এবং মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা থাকবেনা

(৩) কোন গ্রন্থকে স্বতঃ প্রমাণ বলে স্বীকার না করা; নতুবা চিন্তন – মনন এবং উপলব্ধি সত্যতা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

(৪) জীবন প্রবাহকে এই দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে স্বীকার করা, নতুবা জীবন প্রবাহ এবং বৈচিত্র সমূহ কার্য- কারণ নিয়মের অধীন না থেকে কেবল আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হবে।

ঈশ্বর কে স্বীকার না করা ঃ অনুছেদে বলা হয়েছে যদি ঈশ্বর জগতে উপাদান কারণ হয় তাহলে জগত হচ্ছে ঈশ্বরের রূপান্তর এবং সংসারের যা কিছু ভাল–মন্দ, সুখ-দুঃখ, দয়া-নিষ্ঠুরতা দেখা যায় সকলি ঈশ্বর কর্তৃক নির্মিত এবং ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত এবং সুখময় অপেক্ষা অধিক দুঃখময় কেননা সংসারে দুঃখের পাল্লাই ভারী। ঈশ্বর দয়ালু অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর কেননা সংসারের চতুর্দিকে নিষ্ঠুরতারই রাজত্ব।

জগতে প্রায় সকলেই একথা স্বীকার করে যে, সৃষ্টিকর্তা নামে একজন মহাশক্তি ধর ব্যক্তি পৃথিবীতে বিদ্যমান। যার অপরিসীম শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর সব কিছু পরিচালিত হয়। এ বিশ্বাস অতীব সহজ ও সরল। আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তখন দেখতে পাই, জীব-জগতের মধ্যে খাদ্য ও খাদক নিয়ে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। যখন কোন

সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরে ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর হয়তো সেই খাদকের কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু তখন তিনি কি খাদ্য প্রাণীর কাছেও দয়াময়? ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্ট করেছে এই বিশ্বাস বহুলভাবে প্রচলিত। তাই মানুষের উপর তার দয়া–মায়াও বেশী। কিন্তু মানুষ ভেদে তার দয়ার তারতম্য কেন? ঈশ্বর দয়া করিয়া সকল মানুষকেই প্রাণ দান করিয়াছেন এবং দান করিয়াছেন ক্ষুধা–তৃষ্ণা ও সুখ–দুঃখের অনুভূতি সমান মাপে। অথচ মানুষের জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারেই তার দয়ার সমবন্টন নাই কেন? কেহ সুরম্য প্রসাদে বসবাস করে কেহবা করে গাছতলায়। কেহ পঞ্চামৃত (দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, চিনি) আহার করে এবং কেহ জল ভাতের সাথে শুধু লবণ ও লঙ্কাপোড়া পায় কেন? কেহ জন্মের সময় পরিপূর্ণ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্ম ধারণ করে, কেহ আবার অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ হয়ে জন্ম ধারণ করে। ঈশ্বরের দয়া বন্টনে এরূপ পক্ষপাতিত্ব কেন? এ প্রবন্ধে সংকলক মহোদয় আত্মার নিত্যতা, কোন গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার না করা, জীবন প্রবাহের অস্তিত্বকে এই দেহের পূর্বে এবং পশ্চাতে স্বীকার্য নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন।

২য় প্রবন্ধ হচ্ছে "মনের প্রকৃতি এবং কাজ যেভাবে বৌদ্ধ ধর্মে ব্যাখ্যা করা হয়েছে" এ প্রবন্ধে মন কি? মনের প্রকৃতি এবং কাজ, মনের ভিত্তিতে ধর্মপদ, মনশর্ত সাপেক্ষ এবং আপেক্ষিক, অভিধর্মে মনের বিভাগ নিয়ে কিছু বিষয় ভিত্তিক সুন্দর আলোচনা করেছেন। মানুষ জন্মগত সূত্র ধরে একটি দেহ এবং মন লাভ করে। এই দেহ এবং মনকে মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে (নাম–রূপ) বলা হয়। দেহ যেমন নিত্য পরিবর্তনশীল মনও তেমনি নিত্য পরিবর্তনশীল। মাতৃজঠর থেকে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার দৈহিক কাঠামো এক রকম। কিন্তু জন্মগত দৈহিক কাঠামোটা সে শিশুর আমৃত্যু থাকেনা, সেটা যেমন দিন দিন পরিবর্তন হয়। ঠিক তেমনি মনের অবস্থাও একই। মন সকালে এক রকম দুপুরে এক রকম বিকালে এক রকম রাত্রে আর এক রকম । মানুষ মরে গেলে পচে যায় বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়, সকালে বদলায় বিকালে বদলায়। মনের বিভিন্ন কার্য-কারণ সম্পর্কে মূল প্রবন্ধে পাঠকগণ আরো বিস্তারিত জানবেন।

৩য় প্রবন্ধ হচ্ছে "পঞ্চশীল" এখানেও বেশ কয়েকটি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা দেখতে পাই যেমন ঃ পঞ্চশীলের পরিবর্তন সাধক নাম, পঞ্চশীল

অনুশীলন, পঞ্চশীল শিক্ষাপদ, চক্রবর্ত্তী, গুরুধর্ম, আর্যধর্ম, গার্হস্থ্য শীল, নিচ্চা শীল, অরিয়কান্ত, পঞ্চশীল পালনের উপকারিতা (সংক্ষিপ্ত), পঞ্চশীল পালনের উপকারিতা (বিশদ বর্ণনা), পঞ্চশীল ভঙ্গ বা লংঘনের পরিণতি বা কুফল (সংক্ষিপ্ত), পঞ্চশীল ভঙ্গ বা লংঘনের পরিণতি বা কুফল (বিশদ বর্ণনা), পঞ্চশীল চারি স্রোতাপন্ন লক্ষণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ বা ধর্ম। পঞ্চশীলের এ প্রবন্ধটি গৃহীদেরকে খুবই মনযোগ সহকারে পড়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা গৃহী জীবন সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে হলে, পঞ্চশীল প্রতিপালনের দিকে গৃহীদেকে খুবই মনযোগী হতে হবে।

পরিশেষে বলব প্রিয়ভাজন জুয়েল অনেক মেধা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়ে এ গ্রন্থটি সংকলিত করেছে। বৌদ্ধ সমাজ জগরণের ক্ষেত্রে এরকম মেধাবী ছাত্রের একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধ সমাজের মধ্যে অনেক ছাত্র দেখা যায় বটে; কিন্তু ধর্মীয় জ্ঞান সমৃদ্ধ ছাত্রের অভাব চিরকালই রয়ে গেল। সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারের প্রতি অনুরাগী হয়ে বাবু কাজল বড়ুয়া অত্র গ্রন্থটির প্রকাশনার মত গুরুদায়িত্ব বহন করে অপরিসীম পুণ্যের ভাগী হলেন। সংকলক বাবু জুয়েল ও প্রকাশক বাবু কাজল বড়ুয়াকে আমার ভিক্ষুত্ব জীবনের অসংখ্য পুণ্যরাশি দান করছি, তারা উভয়ে এই পুণ্যরাশি লাভ করে সুখী ও নিরাময় জীবন লাভ করুক।

ইতি

(বিপুলবংশ ভিক্ষু)
উপাধ্যক্ষ, গহিরা শান্তিময় বিহার, রাউজান পৌরসভা।
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সিলেট বৌদ্ধ বিহার, সিলেট।
প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী।
সাধারণ সম্পাদক, প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী।
সমাজকল্যাণ সম্পাদক, সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল-বাংলাদেশ।

কিছু-কথা

এখন আমরা একটি নতুন অনুভূতির-ভুবনে ডুকতে যাচ্ছি।

নতুন কেন বলছি? অনেকে তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারেন বা বলতে পারেন বুদ্ধ কি এ বিষয়ে প্রায় ২৫৫৩ বছর আগে বলে যান নি? আমাদের উত্তর-হ্যাঁ, বলে গেছেন। তারপরেও একটি কিন্তু থেকে যায়, তা কি? আসুন, সামান্য সেন্স কাজ করিয়ে নিয়ে ব্যাপারটি একটু বিবেচনা করি।

ধরুন আপনি অতি সম্প্রতি বিয়ে করতে যাচ্ছেন? বা ধরে নিন আপনার খুব চুলকানি রোগ শুরু হয়েছে। আমরা বিশদভাবে বলছি না তবু বুঝুন কি অবস্থা? কি আর অবস্থা? একটিতে আপনার শরীর-মন ঢেকুর তোলার মত উদ্বেল থাকে আর অন্যটিতে পিচঢালা পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে গায়ের চামড়া ছিঁড়ে যাওয়ার মত হিষ-হিষ বিষানুভব হয়।

তাহলে দেখুন এই যে-নতুন অনুভূতিগুলো আমরা উপলব্ধি করছি তা কিন্তু আমাদের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কিন্তু একবার ভাবা কি দরকার নয় যে অনন্ত সংসার চক্রে একই অনুভূতি আমাদের আরো বহুবার নাড়া দিয়েছে কি না? এ জন্যই বলছি এটি নতুন। কারণ তা আমাদের নতুনভাবে ভাবায়, হঠাৎ করে মনে হয় সত্যিতো তাই!

'অনন্ত সংসার চক্র'-বাক্যটি বিশ্বাস সম্পর্কিত তার চেয়ে ছোট অবস্থানের কথা ভাবি; কেউ ভেবে বলবেন-আমার ভাইয়ের বিয়ে দেখেছি; দেখেছি তখন তার কি চেহারা!....কি ভাবাবেগ!.... আবার অনেকে আতংকিত হয়ে বলবেন-চুলকানি! হায়রে কি যে অবস্থা.... তখন যদি তাকে বা ওনাকে বলা হয় আপনার কি হয়েছে? তখন হয়ত তিনি মানের ভয়ে বলতে পারেন, না আমার হয়নি তবে আমার বোনের হয়েছে তো তাই!

যাই বলুক? দেখন একজন আরেক জনের রেফারেন্স দিচ্ছে। এই রেফারেন্সটি আসলে কি? এটি কিন্তু একটি ধারাবাহিকতা, প্রথমে ধরে নিতে পারেন গণিতের ভাষায় একটি সরলরেখা, আরেকটু গভীরে ঢুকলে তা কিন্তু বৃত্ত হয়ে হয়ে যাচ্ছে কেননা সবারি একই অনুভূতিই অভিন্ন চেতনায় ঘোরপাক খাচ্ছে। এটিই তো সংসার চক্র, তাই না? এত সহজও

নয়? কারণ তা অনন্ত। অনন্ত বলতে আমরা (বৌদ্ধরা) কিন্তু কোন সৃষ্টির শুরু গণনা করি না। এর সাথে কারো সম্পৃক্ততাও স্বীকার করি না।

বৌদ্ধ ধর্মে 'ভগবান' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'শিক্ষক'। আমরা যে আল্লাহ-আল্লাহ, ভগবান-ভগবান নামে গোলাযোগ করি। আসলে একবার স্মৃতিশক্তি বাড়িয়ে দেখুন তো আপনার বেশী না চৌদ্ধ গোষ্ঠির নাম মনে করতে পারেন কি না? ফর ইওর কাইন্ড ইনফরমেশন, মায়ের ৭ এবং বাবার ৭ মিলে ১৪ গোষ্ঠি হয়। পারছেন না তো। আচ্ছা আরো সহজ করে দিই, শুধুমাত্র আপনার বাপ পরম্পরা মানে দাদু, তার বাবা বা তার বাবা বা তার বাবার বাবার নাম কি বলতে পারবেন? সাধারণত অনেকের খান্দানিতে হয়ত কিছু নাম থেকে থাকে যা তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের ছোট বয়সে শিখিয়ে থাকে, তবুও। তাহলে দেখুন আমরা যে আল্লাহ-আল্লাহ, ভগবান-ভগবান করে তাদের ইতিহাস নিয়ে সভা-সেমিনার-প্রেস কনফারেন্স করছি একচুয়েলি আমরা নিজেদের দাদুর-দাদু-র নামটি পর্যন্ত জানি না। তাহলে দেখুন, ব্যাপারটি এরকম না যে যার বিয়ে তার হুশ নেই পাড়াপড়শির ঘুম নেই। মানে নিজের গোষ্ঠির নামই জানি না কথা বলি হাজার বছরের....., মানে আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বরের। আবার অনেক ক্ষেত্রে তাদেরও আগের। অনেকে পরম ভাল-মন্দের কথা টানতে পারেন, সেজন্য তাদের কথা আলোচনা করা হয়, তাদের জীবনাদর্শে নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য-এরকম আরো অনেক কিছু.....।

এর একটিই জবাব, দেখুন কারো জীবন কিন্তু এক নয়। সবাই যার যার ক্ষেত্রে আলাদা এমনকি যমজ ভাই পর্যন্ত। অতএব কেউ কারো লিংকেজ নয়। নিজের ভাল-মন্দ নিজেকে উদ্ভুত বাস্তব পরিস্থিতির উপর বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এতে অন্যের ধ্যান-ধারণা শুধু সহায়ক হতে পারে।

অনেকে বলেন-আত্মার রূহের মাগফেরাত কামনা করি বা অনেকে বলেন মহান আত্মার মিলন। বুদ্ধের সমসাময়িক চিন্তায় 'আত্মা' বলতে বুঝতে ধ্রুব, অবিনশ্বর, স্থির, যার কোন পরিবর্তন নেই। কিন্তু বুদ্ধ বলছেন, ও রকম কোন বস্তু নেই যার পরিবর্তন নেই অর্থাৎ ঐ আত্মার ধারণা বৌদ্ধ ধর্মে নেই তবে আত্মা যদি পরিবর্তন হয় তবে আছে মানে 'আত্মার অনিত্যতার' ধারণা বুদ্ধ গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রহণ-টহন কি?

এগুলো কি চন্দ্র-গ্রহণ আর সূর্যগ্রহণ নাকি? বুদ্ধ নিজে ধ্যান-বলে তা লাভ করেছেন, এখানে তো কারো কাছে ধার করা কিছু নেই। আছে শুধু অভিজ্ঞতা, যা অভিজ্ঞাবাদ তিনি প্রচার করে গেছেন।

আমি = মন ও শরীর। মাটি, পানি, বায়ু, আগুন এ চারি মহাভূত নিয়ে শরীর গঠিত। ভূত মানে যা স্বভাবত বিদ্যমান। তারই ফল মন।

পঞ্চশীল, এটি তো ইউনিভার্সেল ট্রুথ।

'গৌতম বুদ্ধের মূল চার সিদ্ধান্ত' রাহুল সাংকৃতায়নের 'বৌদ্ধ দর্শন' যেটি পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির বাংলায় অনুবাদ করেছেন তা থেকে নেয়া হয়েছে। বর্তমানের বাংলা ভাষায় কিছুটা মেজে-ঘষে লেখা হয়েছে।

'মন এবং এর প্রকৃতি' পি. জ্ঞানরামার 'এসেনসিয়াল অব বুড্ডিজম' নামক প্রসিদ্ধ বই থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

'পঞ্চশীল' স্বর্গীয় ডাঃ অন্নদাচরণ বড়ুয়ার ছোট পুস্তিকা থেকে নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে সংঘ সমাজের উদিয়মান সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃজাগরণের অগ্রদূত শ্রদ্ধেয় বিপুলবংশ ভিক্ষুর চিন্তাশীল ভূমিকা, শ্রদ্ধেয় দীপানন্দ ভিক্ষু ও চুল্লপাল শ্রমণের বই দিয়ে সহযোগিতা, বাবু কাজল বড়ুয়ার প্রকাশনার সাহসিক ভার নতুন কিছু উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদেরকে অমাবস্যায় অন্ধকার দূর করে পূর্ণিমার আলো দেখিয়েছে।

আশা করা যায় আপনারাও এগিয়ে আসবেন আরো নতুনের খোঁজে.....

বারবার বারবার বারবার বইটি পড়বেন। সেভাবে আচরণ করবেন।

একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে তা হচ্ছে নিজেদের 'বড়ুয়া' বলতে শরম পাবেন না।

মৈত্রীময় ধন্যবাদ।

তারিখ ঃ ২৩-০১-০৯ আপনাদের জ্ঞাতি-

সিলেট **জুয়েল বড়ুয়া**

'সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তো'

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

প্রকাশকের বক্তব্য

বৌদ্ধ ধর্মে কোন গ্রন্থকে পরম সত্য বলার অর্থ ঐ গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংশয়মুক্ত না হয়ে জিজ্ঞাসার কণ্ঠ রুদ্ধ করা। পান্ডুলিপি পাঠের পর ভগবান, ঈশ্বর, আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ভ্রান্ত-ধারণা এতে দূরীভূত হবে। পঞ্চশীল অনুশীলন ও প্রতিপালনের উপর সুগভীর তত্ত্ব-প্রমাণ এতে আছে।

দরকার শুধু নিজ নিজ জীবনে তা যৌক্তিক সূক্ষ্মচিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে মেনে চলা ও আচরণ করা।

আমার একটি চিন্তা; এই যে বিশ্ব পরাশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্দনে কিছু প্রায়ধর্মকাতর দেশ বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে, এতে দেখুন সামান্য হলেও শান্তির বার্তা আনছে কিছু বিশ্বমানবাধিকার প্রতিষ্ঠান ও তাদের পরিচালকরা। আমার মতে, সব কিন্তু মানুষই করছে।

এই পান্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত চিন্তার ধারাবাহিকতা অনেকটা বিক্ষিপ্ত তবে চিন্তা উদ্রেককারী। তদুপরি, একে রূপ দিয়ে কাঠামো দান করার জন্য বাবু জুয়েল বড়ুয়া আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। আমি অনুজ প্রতিম জুয়েলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞচিত্তে সাধুবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া এরকম কাজের অন্তহীন প্রেরণাদানকারী শ্রদ্ধেয় দীপানন্দ ভিক্ষু।

এই ক্ষুদ্র প্রয়াস বৌদ্ধ-চিন্তার মহলে চেতনার প্রবাহ তৈরীতে সমর্থ হলে অনেকের মতো আমার স্বপ্নও সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

"সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তো"

নিবেদক-
কাজল বড়ুয়া
গ্রাম ঃ মধ্যম বিনাজুরী
উপজেলা ঃ রাউজান
জেলা ঃ চট্টগ্রাম।

তারিখ ঃ ২৩-০১-০৯
সিলেট।

অভিমত

ছাত্র জীবন মানুষের জীবনের অমূল্য সময় সুন্দর পরিবেশে সৎ লোকের সংস্পর্শে সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। তেমনি একজন প্রজ্ঞাদিপ্ত লেখক জুয়েল বড়ুয়ার ..... ছাত্র। গনিতের ছাত্র হলেও ধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি যত্নশীল। সমাজে এমনি অনেক তরুণ আছেন যাহারা নির্মল পরিবেশ না পাওয়ায় প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পড়েছে না। লেখকের এই প্রয়াস খুবই উৎসাহব্যঞ্জক এবং প্রশংসার দাবীদার এইভাবে উৎসাহ প্রদান করছে সমাজে সৎ চিন্তার প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজ উপকৃত হবে। লেখক এই পুস্তিকায় তিনটি বিষয় নিয়ে লিখেন, (১) পঞ্চশীল এর ব্যাখ্যা (২) মন ও তার প্রকৃতি (৩) বুদ্ধের মৌলিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোকপাত। নিঃসন্দেহে প্রবন্ধত্রয় জ্ঞানগর্ভ হয়েছে। পণ্ডিত এবং সাধারণের সুখ পঠ্য হয়েছে। তবে পঞ্চশীল ছাড়া অপর লেখা দুইটি (মন ও তার প্রকৃতি খুবই বৌদ্ধের মৌলিক তত্ত্ব) পণ্ডিতগণের ভবগাম্ভীর্য।

এই ধরণের পুস্তিকা যতই প্রকাশিত সমাজ তথই উপকৃত হবে। বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক অবস্থায় আচরণ, সুবিন্যস্ত হবে। অন্ধ ভক্তিবাদী মানসিকতার পরিসমাপ্তি ঘটবে, মানব সমাজ বৌদ্ধ ধর্মের যে সার্বজনীন আবেদন এবং কুসংস্কার বিজিত বিজ্ঞজনের আচরণীয় ধর্ম তাহা দিবালোকের মত উৎভাসিত হবে। লেখক থেকে আরও এই ধর্মের জ্ঞানগর্ভ লেখা আশা করি।

দীপানন্দ ভিক্ষু
আবাসিক, রামকোট বনাশ্রম বৌদ্ধ বিহার
রামু, কক্সবাজার।
প্রাক্তন বিহারাধ্যক্ষ, সিলেট বৌদ্ধ বিহার
সিলেট।

গৌতম বুদ্ধের মূল সিদ্ধান্ত

সদ্ধর্ম পিপাসুরা যদি বুদ্ধের মূল চারি সিদ্ধান্তকে প্রথমে জেনে নেন তাহলে বুদ্ধের উপদেশ সমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়ক হবে। সেই চারি সিদ্ধান্তের মধ্যে তিনটি নেতিবাচক এবং একটি ইতিবাচক, চারি সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ ঃ

১) ঈশ্বরকে স্বীকার না করা; নতুবা 'মানুষ নিজেই নিজের প্রভু' এই সিদ্ধান্তের বিরোধ হবে।

২) আত্মাকে নিত্য বলে স্বীকার না করা; নতুবা এটির পরিশুদ্ধি এবং মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা থাকবে না।

৩) কোন গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার না করা; নতুবা চিন্তন-মনন এবং উপলব্ধির সত্যতা নস্যাৎ হয়ে যাবে।

৪) জীবন প্রবাহকে এই দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে স্বীকার করা, নতুন জীবন প্রবাহ এবং বৈচিত্রসমূহ কার্য-কারণ নিয়মের অধীন না থেকে কেবল আকস্মিক ঘটনা বলে মনে হবে।

বৌদ্ধ ধর্মে এই চারি সিদ্ধান্ত সর্বমান্য। আমরা এই সিদ্ধান্তকে পৃথকভাবে বিচার করে দেখব।

১) ঈশ্বরকে স্বীকার না করা ঃ

ঈশ্বরবাদীরা বলেন-"যেহেতু প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে, অতএব সংসারেরও কোন কারণ থাকা উচিত - এবং ঐ কারণ হচ্ছে 'ঈশ্বর'। তবে প্রশ্ন হতে পারে-ঈশ্বর কিরূপ? এটির উপাদান-কারণই বা কি, যেমন মাটির কলসীর কারণ হচ্ছে মাটি এবং স্বর্ণ কুন্ডলের কারণ হচ্ছে সোনা। যদি ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণ হয় তাহলে জগত হচ্ছে ঈশ্বরের রূপান্তর এবং সংসারের যা কিছু ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, দয়া-নিষ্ঠুরতা দেখা যায় সকলি ঈশ্বর নির্মিত এবং ঈশ্বরের মধ্যে নিহিত এবং সুখময় অপেক্ষা অধিক দুঃখময় কেননা সংসারে দুঃখের পাল্লাই ভারী।

ঈশ্বর দয়ালু অপেক্ষা অধিক নিষ্ঠুর কেননা সংসারের চতুর্দিকে নিষ্ঠুরতাই রাজত্ব। যদিও বা ফুলহীন বৃহৎ বৃক্ষকে প্রাণবন্ত বলে স্বীকার করি না, তাহলেও সূক্ষ্মবিসূক্ষ্ম কীটাণু হতে আরম্ভ করে পোকামাকড়, পাখি, মাছ, সাপ, টিকটিকি, শিয়াল, নেকড়ে বাঘ, সিংহ, সভ্য-অসভ্য মনুষ্য সকলেই একে অন্যের খাদ্য খাদক। মনোযোগ সহকারে দেখলে ধরা পড়বে যে দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত জগত এক রোমাঞ্চকারী যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে দুর্বল প্রাণী সবলের খাদ্য হচ্ছে। যারা পুর্নজন্ম মানে না তাদের ত এটিকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে। পুর্নজন্মবাদী অবশ্যই বলতেন যে সমস্ত কিছুই পূর্ব কর্মের ফল। কিন্তু এটিও চিন্তনীয়। ভাল-মন্দ কর্মের জন্য (সুস্থ এবং) সজ্ঞান মনুষ্যকেই দায়ী করা যায়। পাগল, নেশাগ্রস্থ বা অবোধ বালককে অন্যের হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কে অস্বীকার করবে যে মানুষের চেয়ে নিচু প্রাণী স্বকর্মের জন্য দায়ী হতে পারে না। কারণ এটি নিজের ভাল-মন্দ কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানহীন এবং যার জীবন অন্যকে হত্যার উপরই নির্ভরশীল? মনুষ্যদের মধ্যেও বালক, পাগল ইত্যাদিকে আলাদা করে দিলে দায়িত্বশীল মানুষের সংখ্যা অনেক কম থেকে যাবে। যদি জগতে দায়িত্বশীল মানুষের সংখ্যা দেড় অরব ধরে নেওয়া যায়, তাহলে ফল ভোক্তা এত মানুষ কোথা থেকে আসবে যাদের সংখ্যা অনন্ত? দেড় অরবের বেশী তা কচ্ছপও আছে যারা মানুষ অপেক্ষা দীর্ঘায়ু সম্পন্ন। কীটাণু এবং হস্তী, বৃষাদি বিশালদেহী জন্তুদের তো কথাই নেই।

উপাদান-কারণই যদি থাকে, তাহলে নির্বিকার কি করা হবে? যদি ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ মানা হয় অর্থাৎ ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করে যেমন কুমার ঘট তৈরী করে, স্বর্ণকার সোনারচুড়ি তৈরী করে, তা হলে প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈশ্বর কি উপাদান ছাড়া জগৎ সৃষ্টি করেন, না উপাদান-কারণ দ্বারা? যদি উপাদান-কারণ ছাড়া সৃষ্টি হয় তাহলে অভাব হতে ভাবের উৎপত্তিকে স্বীকার করতে হবে এবং কার্য-কারণের সিদ্ধান্ত মিথ্যা হয়ে যাবে। তা যদি হয়, তাহলে জগৎকে দেখে এর কারণস্বরূপ ঈশ্বরকে মানার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? যদি ইন্দ্রজালের ন্যায় সে জগৎকে কারণ ছাড়া মায়াময়রূপে উৎপন্ন করে থাকেন, তা হলে মায়াময় প্রত্যক্ষের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুমান কিসের শক্তিতে হবে? যদি

উপাদান-কারণ দ্বারা সৃষ্টি করে থাকে, তাহলে কি কুমারের ন্যায় আলাদাভাবে অবস্থান করে সৃষ্টি করে, না তাতে আচ্ছন্ন থেকে সৃষ্টি করেন? আলাদা থাকলে সে সর্বব্যাপক হতে পারেন না, এবং সৃষ্টি করার জন্য তাকে অন্যান্য সহায়ক ও সাধনের উপর নির্ভর করতে হবে। বিদ্যুৎ কণা থেকে সুক্ষ্মতর পরমাণুকে (neutron) ভাগ করার জন্য এবং এদের মিশ্রণের দ্বারা ক্রমশ স্থূলঃতর দ্রব্যসমূহকে তৈরী করার জন্য স্বর্ণকারের সাঁড়াশীর ন্যায় তিনি কোন্ যন্ত্র প্রয়োগ করেন? যদি তাকে উপাদান-কারণেই সর্বব্যাপক বলে মেনে নেওয়া যায় তাহলে উপাদান-কারণ ছাড়া উৎপাদন করতে সক্ষম, তাকে সর্বশক্তিমান কি করে বলা যাবে? এই অবস্থায় অন্যায়, অপবিত্রতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি অন্যায়ের স্রোতের জন্য সেই দায়ী হবেন।

এভাবে সে না উপাদান-কারণ হতে পারে না নিমিত্ত-কারণ। জগৎ সৃষ্টির পেছনে কোন আদিকারণ থাকতে হবে, এটির কোন আবশ্যকতা নেই। যদি "এর কারণ কি", "এর কারণ কি" প্রশ্ন করলে জগৎএর কোন সূক্ষ্মতম বস্তু বা এর বিশেষ শক্তির উপর নির্ভর না করতে হয়, তাহলে ঈশ্বর পর্যন্ত গিয়ে থেমে থাকলে চলবে কেন? ঈশ্বরকেই বা দ্বিতীয় কারণ বলে মনে নিতে অপরাধ কোথায়? এভাবে ঈশ্বরকে আদিকারণ বলে স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

কর্তা-ধর্তা ঈশ্বর হলে, মানুষ তার হাতের পুতুল। তাহলে ভাল-মন্দ কাজের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। কিন্তু সংসারে তার দুঃখভোগ কি ঈশ্বরের দয়ালুতারই প্রকাশ?

ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা একথা মেনে নেওয়া ঠিক নয়। সৃষ্টি যদি অনাদি হয়, তাহলে এর কোন কর্তার প্রয়োজনীয়তা নেই, কেননা কর্তা হতে হলে তাকে কার্যের পূর্বভাগে উপস্থিত থাকা উচিত। যদি সৃষ্টি আদি হয়, তাহলে কোটি-দুকোটি, অরব-দু-অরব, খবর-দুখবর বর্ষ নয়, অচিন্ত্য অনন্ত বর্ষ ধরে সৃষ্টি উৎপন্ন হওয়ার সময় পর্যন্ত সেই ক্রিয়াশূন্য ঈশ্বরের অবস্থিতির প্রমাণ কি? ক্রিয়াই তো তার অস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে?

ঈশ্বরকে যদি স্বীকার করা হয় যেমন পূর্বে করা হয়েছে, মানুষ তার অধীন হবে। তখন মানুষ নিজেই নিজের প্রভু হবে, যথেচ্ছা নিজেকে বানাতে

পারবে-একথা স্বীকার করা যাবে না। তাহলে মানুষের শুদ্ধি ও মুক্তির জন্য প্রযত্ন করার সার্থকতা কোথায়? তাহলে ধর্মসমূহের প্রদর্শিত পথ এবং ধর্মও নিষ্ফল। ঈশ্বরকে স্বীকার না করলে মানুষ বর্তমানে যা, তা নিজ কৃত কর্মের ফল এবং ভবিষ্যতে যা হবে, তাও নির্ভর করবে বর্তমান কর্মফলের উপর। মানুষের কর্ম করার স্বতন্ত্রতা থাকলে ধর্ম উপদেশ এবং ধর্মের সার্থকতা হতে পারে। ঈশ্বরবাদীদের দ্বারা সহস্র সহস্র বৎসর ধরে ধর্মের জন্য অশান্তি এবং রক্তপাতের স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তবুও ঈশ্বর কেন এর নিষ্পত্তি করছেন না?

২) আত্মার নিত্যত্ব ঃ

এখানে প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে বৌদ্ধরা আত্মাকে কিভাবে স্বীকার করে থাকেন। বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণ, পরিব্রাজক এবং অন্যান্য মতের আচার্য্যগণ স্বীকার করতেন যে, দেহাভ্যন্তরে এবং দেহ হতে ভিন্ন এক নিত্য চেতনশক্তি আছে, যা দ্বারা দেহে উষ্ণতা এবং জ্ঞানপূর্বক চেষ্টা দেখা যায়। যখন এটি দেহ ত্যাগ করে কর্মানুসারে দেহান্তরে চলে যায়, তখন দেহ শীতল, অক্ষম, অসার হয়ে যায়। এই নিত্য চেতনাশক্তিকেই বৌদ্ধরা আত্মা বলে। Semitic-দেরও তাই মত। এটি ব্যতিত বৌদ্ধের সময়ে আরো আচার্য্যগণ ছিলেন যাঁদের বক্তব্য ছিল-দেহ হতে পৃথক কোন আত্মা বলে কিছু নেই। দেহে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত রস সমূহের কারণে উষ্ণুতা এবং চেষ্টা উৎপন্ন হয় এবং রসসমূহের পরিমাণ কমবেশী হলে তা চলে যায়। সেরূপ আত্মা দেহ হতে ভিন্ন কোন বস্তু নয়। বুদ্ধ একদিকে আত্মাকে নিত্য এবং শাশ্বত বলে মানা এবং অন্যদিকে দেহের সঙ্গেই আত্মার বিনাশ হয়ে যায়-এই দুই চরম মতকেই বাদ দিয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেছেন-আত্মা কোন নিত্য চিরস্থায়ী বস্তু নয়, বরং এটি স্কন্ধাদি (শরীর, মন) মূল কারণের সমবায়ে উৎপন্ন একটি শক্তি, যা অন্যান্য বাহ্য শরীর সমূহের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন এবং বিলীন হয়ে যাচ্ছে। চিত্তের ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশ হলেও চিত্ত প্রবাহ যতক্ষণ দেহে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ দেহ সজীব থাকে। আমাদের আধ্যাত্ম পরিবর্তন এবং দেহের পরিবর্তনের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের দেহ প্রতিক্ষণেই পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমান চল্লিশ

বৎসরের যে দেহ তা পাঁচ বা বিশ বৎসর পূর্বের দেহ হতে ভিন্ন এবং সাত বৎসর বয়সে এটি এরূপ থাকবে না। যে সকল অণু দ্বারা এই দেহ উৎপন্ন সেই সকল অণুর প্রত্যেকটি প্রতি মুহূর্তে নব উৎপন্নের জন্য নিজের স্থান খালি করে দিচ্ছে। এইরূপ হলেও প্রত্যেক বিগত দেহ-নির্মাতা পরমাণুর উত্তরাধিকারী নানা দিকে এটির সদৃশ হয়ে থাকে। এইভাবে যদিও আমাদের প্রথম বৎসরের দেহ, দশম বৎসরে (এক) থাকে না, এবং বিশ বৎসরে, দশম বৎসরের দেহও আর থাকে না, তাহলেও একই পরিবর্তন হেতু আমরা স্থূলভাবে একই দেহ বলে থাকি। সেরূপ আত্মাও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে, কিন্তু একই পরিবর্তন হেতু এটিকে একই বলে থাকে। নিজের জীবন দ্বারাই দেখুন না। দুই বৎসর পূর্ব (হয়ত) দূর হতেও সিগারেটের ধোঁয়া আপনার অসহ্যবোধ হত। আর এখন তৃপ্তির সাথে নিজেই সিগারেট খেতে থাকেন। দুই বৎসর পূর্বেও (হয়ত) নিজে কোন পাখি শিকার করে এটিকে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে দেখে আপনার আনন্দ হত। আর এখন অন্যের দ্বারা আহত পাখির যন্ত্রণা দেখে আপনি নিজেই ছট্‌ফট্ করতে থাকেন। যদি আপনি নিজের মনের স্বভাব এবং প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রতিমুহূর্তে ডায়রীতে লিখে রাখার অভ্যাস থাকে তাহলে দশ বৎসর পূর্বের ডায়রী নিয়ে পাঠ করতে আরম্ভ করুন-দেখবেন, তাতে অনেক বিচার আছে যেগুলো দশ বৎসর পূর্বে আপনি নিজের বিচার বলে গর্ব করতেন। এখন যদি কেউ আপনার দশ বৎসর পূর্বের সেই ডায়রী আপনাকে পাঠ করে শোনায়, আপনি তৎক্ষণাৎ বলবেন-"না না, এই বিচার আমার নয়, আমার বিচার কখনো এরূপ হতে পারে না।" বস্তুতঃ আপনার এরূপ অযৌক্তিকও নয়। কারণ বিগত দশ বৎসরে আপনার অনুভূতির মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধন হয়েছে।

আপনি হয়ত বলবেন-মনের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু আত্মার পরিবর্তন হতে পারে না। আমাদের এই বক্তব্য যে, মনের অতিরিক্ত আত্মা বলে কিছুই নেই। চিত্ত, বিজ্ঞান, আত্মা সবি এক বস্তু। যে প্রকারে আমরা চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা এবং ত্বক ইন্দ্রিয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করি, মনকে করতে পারি না। মনের সত্তাকে আমাদের কেন স্বীকার করতে হয়? চোখ দেখে তেঁতুল, আর জিভে আসে জল। নাকে

আসে দুর্গন্ধ, আর হাত স্বাভাবিকভাবে নাকে চলে যায়। দেখুন, চোখ এবং জিভ এক নয়, একের সাথে অন্যের কোন মিল নেই। এজন্য এই দুয়ের মিল ঘটাবার জন্য তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। ঐ তৃতীয় ইন্দ্রিয়টিই হচ্ছে মন। দেহের পাঁচটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ জ্ঞানকে যে স্থানে পৌঁছায় এবং যে স্থান হতে দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের গতির অনুশাসন পাওয়া যায়, তা হচ্ছে মন। অর্থাৎ মনের দ্বারাই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। মনই গ্রহণ, চিন্তন ও নির্ণয় করে। কিভাবে করে? সেনাবাহিনীর কমান্ডারের ন্যায় আলাদা (নিরাপদ) জায়গায় অবস্থান করে নয়। বরং এইরূপে-মনে করুন পাঁচটি কাচের টিউবে লাল, হলুদ, সবুজ, নীল এবং কালো রংয়ের চূর্ণ আছে এবং নিচে এমন একটি কাচের নল হতে জল বেরুচ্ছে, যাতে উক্ত পাঁচটি টিউবের মুখ যুক্ত হয়েছে এবং টিউবগুলোর মুখ একটির পর একটি খুলে যাচ্ছে। যে সময়ে যে রং জলে পড়বে, জলকে ঐ রংয়ে দেখাবে। যেরূপ চোখের সামনে কালো সাপ পড়লে আমরা কালো সাপই দেখব। এই জ্ঞানই দ্রুত মনে গিয়ে পৌঁছায়। ঐ মুহূর্তের মন, যা নিজ কারণভূত পুরাতন মনের অনুভব সমূহের বীজ নিজের মধ্যে রাখে, এই নতুন জ্ঞানরূপী চূর্ণ পড়লে একাকার হয়ে ভয়ের রংয়ের রঞ্জিত হয়। যদি সাপকে দেখামাত্রই আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি, তবুও কিছুটা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেওয়া চাকার মতো কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত একের পর এক উৎপন্নশীল মন ঐ রংয়ে রঞ্জিত হবে। যদিও প্রত্যেক দ্বিতীয় মুহূর্তের মনের উপর একটির প্রভাব দুর্বল হতে থাকবে। আর যদি ঐ সাপ কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত দেখা যায় এবং নিজের দিকে ছুটে আসে, তাহলে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্নশীল মনে ভয়ের সঞ্চার অধিক হতে থাকবে। যে সত্য ভয়প্রদ বিষয়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যাই হোক, উক্ত কারণে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত এদের সংযোজক এক আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করা প্রয়োজন-এটিকে বলে মন। এটির বাইরে আত্মার আবশ্যকতা কোথায়? যদি বলা হয়, পুরোনো অনুভবসমূহকে স্মৃতিরূপে রক্ষা করার জন্য, কেননা মন ক্ষণিক (যদিও এই কথা তারা বলতে পারেন না? যাদের মতে মন ক্ষণিক নয়।)-

তাহলে আমরা বলবঃ মন ক্ষণিক, কিন্তু এটি নিজের পরবর্তী মনের কারণও বটে। বংশানুক্রমিক নিয়মানুসারে, যেমন ঃ- মাতা-পিতার অনেক দোষ-গুণ পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে বর্তায়, সেরূপ পর্বের মন স্বীয় অনুভবসমূহের বীজ বা সংস্কার পরবর্তী মনের জন্য উত্তরাধিকার স্বরূপ রেখে যায়, এবং তা হয় স্মৃতির কারণ। বস্তুতঃ সংস্কারের ছাপ ক্ষণিক বস্তুর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। আত্মাকে যদি চিরস্থায়ী এবং নিত্য বলে মানা যায়, তাহলে এটি অনন্তকাল পর্যন্ত অপরিণামী থাকবে। কিন্তু, সর্বদা অপরিবর্তনীয় আত্মার উপর অনুভব-সমূহের ছাপ কিভাবে পড়বে? যদি পড়ে, তাহলে ছাপ পড়া মাত্রই এটির রূপ-পরিবর্তন হবে, আত্মা কোন জড় পদার্থ নয়, যার কেবল বাহ্য অবয়বের উপরই দাগ লাগবে, এটি চেতনময়, এজন্য এ অবস্থাতে ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান এটিতে সর্বত্র প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। আবার এই রাগ, দ্বেষ, মোহ-ইত্যাদির কোন এক রূপযুক্ত হয়ে যাবে। তাহলে এটি সেই আত্মা নয় যা ছাপ পড়ার পূর্বে ছিল। অতএব এটি অপরিণামী হতে পারে না। তাহলে আত্মা নিত্য কিভাবে হবে? যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনে নেওয়া যায় যে, ছাপ পড়ে, তাহলে সেই অভৌতিক সংস্কারও নিত্য আত্মাতে পরার অবিচল হয়ে যাবে। তখন আবার শুদ্ধি বা মুক্তির আশা কিভাবে করা যেতে পারে? যদি বলেন-কোন নিত্য আত্মা নেই, তাহলে যেহেতু মন ক্ষণিক, সেজন্য দেহ বিনষ্ট হলে ভাল-মন্দ কর্মের বিপাক কিভাবে হবে? এখানে প্রথমে একথা বুঝতে হবে যে, বৌদ্ধরা কিভাবে বিপাককে গ্রহণ করেন। তারা এটি মানেন না যে, আমরা যা কিছু ভাল-মন্দ কর্ম সম্পাদন করি, তা লিখে রাখার জন্য ঈশ্বর আমাদের পেছনে ষ্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করেছেন। আমরা ভাল বা মন্দ যেকোন কায়িক-বাচনিক কর্ম সম্পাদন করি, সমস্ত কর্মের উদ্ভব আমাদের মনে। অতএব দ্বেষযুক্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য মনকে দ্বেষযুক্ত করতে হয়; রাগযুক্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য মনকে রাগযুক্ত করতে হয়। মনের সেরূপ ক্রিয়া ও ধ্বনির রেশ ততক্ষণ জারী থাকে যতক্ষণ না বিরোধী কোন ধ্বনি বা ক্রিয়ার সাথে এটির সংঘাত ঘটে। মানুষ একদিনেই নিষ্ঠুর হতে পারে না। অপারেশনকারী ডাক্তারকেও ধীরে ধীরে নিজের মনকে শক্ত করতে হয়, খুনির তো প্রশ্নই নেই। কোন অসহায়, নিরপরাধ বালিকাকে

প্রহার করতে দেখে দর্শকদের চিত্ত প্রভাবিত না হয়ে পারে না (যদিও এটি অন্যদিকে-করুণার দিকে), তাহলে স্বয়ং প্রহারকারীর মন কঠোর না হয়ে পারে না। সুতরাং আমরা যে কাজ করি, তার প্রভাব তাৎক্ষণিক মনের উপর পড়ে। মন যত শক্ত হবে-ততটা এতে সূক্ষ্ম মানসিক চিন্ত ন এবং বিকাশের যোগ্যতা কমতে থাকে।

ভাল-মন্দ মনোভাব ধন আর ঋণের মত। যদি ধনরাশি অধিক আর ঋণরাশি কম হয় ধনের পাল্লা ভারী হবে। মনের ক্ষণ-ক্ষণের পরিবর্তনের সময় এই হিসাব চলতে থাকে। এখানে মাস, সপ্তাহ বা দিনের হিসাব নেই, প্রতি মুহূর্তে হিসাব চলে। বর্তমান মানুষ হচ্ছে তার পূর্ব-পূর্ব (জন্মে) কৃত ভালমন্দ কর্মের সাময়িক ফল। দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন শীল মনের অনেক কিছু নিজ জনক-মন (অর্থাৎ প্রথম ক্ষণের মন) হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। এই উত্তরাধিকার নিয়ম আমাদের শৈশবাবস্থা হতে বার্ধক্য পর্যন্ত চলতে থাকে-এটি বুঝতে কষ্ট হবে না। কিন্তু বুদ্ধের শিক্ষানুসারে এই নিয়ম জন্মের আগেও ছিল এবং মৃত্যুর পরেও থাকবে। মৃত্যুর সময় চিত্তপ্রবাহ নিজ সংস্কার রাশির সাথে এই জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই সংস্কার রাশিরূপী চুম্বক চিত্তপ্রবাহকে একই ধর্মযুক্ত নিকটতম দেহে আকর্ষিত করে পুনরায় এটির চিরাচরিত কারবার শুরু করে দেয়। যতদিন না তৃষ্ণা ক্ষয়ের দ্বারা এই সন্ততি বিশৃঙ্খল হচ্ছে এবং নির্বাণ উপলব্ধি না হচ্ছে ততদিন এই ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। এভাবেই কর্ম, কর্মফল এবং জন্মান্তর হয়।

জীবকে নিত্য বলে স্বীকার করলে বহু দোষ হয়। যদি নিত্য বলেন, তাহলে শুধু অমরই নয়, আজন্ম বলে মানতে হবে। আর যেখানেই পুর্নজন্ম স্বীকৃতি নেই, সেখানে একথা মানতে হবে যে জীব অরব-খরব বর্ষ নয়, বরং অনাদিকাল হতে আজ পর্যন্ত চুপচাপ নিশ্চেষ্ট পড়ে রয়েছে। এক, পঞ্চাশ বা শতবর্ষের জন্য, কোন পূর্ব কর্ম ছাড়াই, এই সংসারে জন্মান্ধ বা নেত্রবান, জন্মরোগী বা সুস্থ, মন্দ বুদ্ধি বা প্রতিভাশালী হয়ে উৎপন্ন হয়েছে আবার মৃত্যুর পর অনন্তকালের জন্য নিজের কিছু ভাল-মন্দ কর্মহেতু স্বর্গ বা নরকে নিক্ষেপ করা হবে। এই জাতীয় নিত্যতাকে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করা যায় কি? যারা পুর্নজন্ম স্বীকার করেন, আর সঙ্গে সঙ্গে

আত্মাকেও নিত্য বলেন, তাদের এই উভয় সিদ্ধান্ত পরস্পর বিরোধী। নিত্য হলে চিরস্থায়ীও হবে অর্থাৎ অপরিণামী থাকবে। আবার এই অপরিণামী বস্তুকে পরিশুদ্ধ বলা যায়, তাহলে এটি জন্ম-মৃত্যুর চক্রে কিভাবে পড়বে? যদি অশুদ্ধ বলা যায়, স্বভাবতই অশুদ্ধ হলে মুক্তি কি করে হবে? নিত্য চিরস্থায়ী হলে সংস্কারের ছাপ তাতে পড়ে না, একথা আমরা পূর্বে বলেছি। যদি ছাপের জন্য মনকে মানা যায়, তার আত্মাকে মানার কোন আবশ্যকতা থাকে কি?

প্রশ্ন হতে পারে যে, যদি মন ও আত্মা এক হয়, এবং এটি ক্ষণিক হয়, তাহলে অনেকত্বের মধ্যে "আমি পূর্বে ছিলাম, আমি এখন আছি"-এই একত্বের আভাস কেন হয়? এটির উত্তর হচ্ছে, সবকিছুর মধ্যে একত্বের আরোপ জগতের সার্বভৌমিক নিয়ম। সংসারের যেকোন একটি দ্রব্যকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে হাজার হাজার অণুর সমষ্টিতে ঐ দ্রব্যটি উৎপন্ন হয়েছে এবং প্রত্যেক অণুর মধ্যেখানে যথেষ্ট ব্যবধান আছে। লোহা, প্লাটিনাম, হীরা-প্রত্যেকের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। আমাদের যদি সুক্ষ্ম দৃষ্টি থাকত তাহলে আমরা দেখতে পেতাম যে প্রত্যেক অণুর মধ্যে ব্যবধান আছে, যে ব্যবধান আমরা জঙ্গলের গাছপালার মধ্যে দেখতে পাই। এইভাবে জগতের সমস্ত দৃশ্য পদার্থের মূলে অনেকত্ব থাকলেও এক বলে ধরা হয়। অগণিত খন্ড দ্বারা নির্মিত দেহকে আমরা একই দেহ বলে থাকি। অনেক বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ জঙ্গলকে একই জঙ্গল বলা হয়। অনেক তারার সমষ্টিকেও তারাই বলা হয়। তবে হ্যাঁ, তফাত নিশ্চয়ই আছে। যেখানে দেহ বন এবং তারার মধ্যে অংশী এবং অংশ এক কালে এক দেশে বর্তমান থাকতে দেখা যায়, সেখানে মন প্রতিক্ষণেই একের পর এক উৎপন্ন হয়ে চলে। এটির জন্য ভাল উদাহরণ হচ্ছে-উড়ন্ত বিমানের পাখা বা চলন্ত বৈদ্যুতিক পাখা। এই পাখা এত দ্রুত গতিতে একস্থান হতে অন্যস্থানে এসে পৌঁছে যে আমরা ধরতেই পারি না এবং মনে হয় যেন একটি চাকা ঘুরছে। সেইরূপ মনও এত দ্রুত গতিতে নিজের স্থানে অন্য মনকে উপস্থিত করতে থাকে যে, মধ্যখানের ব্যবধানকে আমরা ধরতে পারি না এবং আমাদেরও উক্ত অবাস্তব চাকার মত মনে হয় যেন মন একটাই। নদীর স্রোতকেও আমরা এক বলি, কিন্তু সেই জল কি অসংখ্য

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিউট্রনের সমষ্টি নয়? বস্তুত সংসারে সকল স্থানের সমষ্টিকে এক বলা হয়ে থাকে। যখন আমাদের ভাষার এটি এক সার্বভৌমিক প্রয়োগ তখন ক্ষণিক মনের প্রবাহকে সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা এক বলে থাকি, তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? আশ্চর্য হচ্ছে এই যে সারা দুনিয়ায় এক বলে পরিচিত দ্রব্যসমূহকে সমষ্টিগত দেখেও আমরা জিজ্ঞাসা করি,-সমষ্টিগত, হলে আত্মা কেন এক বলে মনে হয়? প্রশ্ন হতে পারে যখন আত্মা ক্ষণিক, পরমুহূর্তে এটি থাকে না। তাহলে এটির পূর্ণতা এবং পরিশুদ্ধি কি করে হবে? উত্তর হচ্ছে-আমরা মনকে ক্ষণিক বলে স্বীকার করলেও মনের প্রবাহকে ক্ষণিক বলে গ্রহণ করতে পারি না। গঙ্গার জল, এর আধার-উভয়ই কূল এবং বালুকাভেদে অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে, তাহলেও সকলের প্রবাহ বর্তমান থাকে-এবং আমরা সকলকে গঙ্গাই বলে থাকি। এইভাবে চিত্তসন্ততির পরিশুদ্ধি এবং পূর্ণতা করতে হয়। যতটা চিত্তসন্ততির রাগ, দ্বেষ এবং মোহের মালিন্য থেকে মুক্ত হয়, ততটাই উক্ত ব্যক্তির কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্ম পরিশুদ্ধ হতে থাকে, তার ফলস্বরূপ নিজের এবং পরের উপকার করার কার্য সমর্থ হয়। পরিবার, গ্রাম, দেশ, ভূমন্ডলের প্রাণীমাত্রই স্বার্থকে সে নিজের স্বার্থ বলে মনে করে, নিজের ক্ষুদ্র গন্ডিকে অনন্ত পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সেই সময় অনন্ত পরিধিযুক্ত সেই তৃষ্ণা বন্ধনমুক্ত হয়ে তৃষ্ণাই থাকে না-ঐ ব্যক্তির জন্য নির্বাণের মার্গ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং দুঃখের বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে। মুক্তি পর্যন্ত পৌঁছতে হলে ব্যক্তিকে নিজের স্বার্থের সীমা পার করে লোকহিতের জন্য সমস্ত কিছুকেই উৎসর্গ করতে হয় (জাতকে সুন্দর সুন্দর কাহিনীগুলোকে দেখুন পূর্ণতার জন্য বোধিসত্ত্বকে কত কি ত্যাগ করতে হয়েছিল)। তৃষ্ণাকে ত্যাগ করার অর্থ দুঃখের পথ রুদ্ধ করা, কেননা সংসারে অধিকাংশ দুঃখই তৃষ্ণা এবং স্বার্থের কারণে হয়। যেহেতু চিত্তসন্ততি ক্ষণিক নয় সেহেতু এটির পূর্ণতা এবং পরিশুদ্ধি করতে হয়। বস্তুতঃ যদি আত্মাকে নিত্য চিরস্থায়ীরূপে স্বীকার করা না হয়, এটির স্থানে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্নশীল চিত্তসন্ততিতে স্বীকার করা যেতে পারে-শব্দের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই যেহেতু "আত্ম" শব্দ নিত্য চেতন বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়, অতএব বুদ্ধ "অন্-আত্ম" শব্দ ব্যবহার করেছেন।

৩) কোন গ্রন্থকে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার না করা

কোন ধর্মীয় গ্রন্থকেই নির্বিচারে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা যায় না। কারণ প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের নিজের শাস্ত্রীয় গ্রন্থকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করে এবং অন্যদেরকেও এটিকে স্বীকার করে নিতে প্রয়াস করে। ব্রাহ্মণ বেদকে প্রমাণস্বরূপ স্বীকার করে, কিন্তু বেদের অনেক কথা অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাবলী এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরোধী। তাহলে বেদকে প্রমাণরূপে কি করে গ্রহণ করা যাবে? যদি বলা যায় যে, বেদ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়, তাহলে প্রশ্ন হবে-কিরূপে এটি জানলেন? এটির সিদ্ধান্তের জন্য অবশেষে বুদ্ধির আশ্রয় নিতে হয়। তাহলে এটির দ্বারা এই কথা সিদ্ধ হয় না কি যে, বেদের প্রামাণিকতাও বুদ্ধি নির্ভর? তাহলে বেদ অপেক্ষা বুদ্ধিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায়। বেদ সম্বন্ধে এখানে যা বলা হয়েছে, তা বাইবেল, এঞ্জেল, কোরআনাদি গ্রন্থসমূহের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বস্তুত যেখানে ঈশ্বর নেই, সেখানে ঈশ্বরের গ্রন্থ কোথা হতে আসবে? ধর্মগ্রন্থকে প্রমাণরূপ গ্রহণ করতে যাওয়া সংসারে কত ভয়ংকর অত্যাচার হয়ে গেছে। গ্যালিলিওর ঐ দুর্গতি হত না, যদি বাইবেলকে প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করা না হত। বাইবেলকেই একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণহেতু আরো কত বৈজ্ঞানিককে জীবন দিতে হয়েছে। গ্রীক তাত্ত্বিকদের হাজার হাজার বৎসরের চিন্তাপ্রসূত গবেষণা গ্রন্থাকারে তাদের গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু মুসলমান বিজেতারা কোরআনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করায় ঐ সকল গ্রন্থকে ভস্মীভূত করেছে। সহিষ্ণুতার অভাবেই কোন ধর্মগ্রন্থকে একমাত্র প্রমাণরূপে গ্রহণ করা হয়। এ অসহিষ্ণুতা হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষ জাতিকে ধর্মান্ধতা, মিথ্যা বিশ্বাস আর মানসিক দাসত্বের গহ্বরেই শুধু নিক্ষেপ করে নি, জ্ঞানের প্রসারতাকে রুদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীকে বারবার রক্ত রঞ্জিত করতেও সহায়তা করেছে। খ্রিষ্টীয় ধর্মযুদ্ধের কারণ কি ছিল? বাইবেল ও কোরআনের প্রামাণিকতা নিয়ে বিবাদেরই ঐ পরিণাম।

কোন গ্রন্থকে স্বত্বঃপ্রমাণরূপে গ্রহণ করার অর্থ ঐ গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে সংশয়যুক্ত না হয়ে জিজ্ঞাসার কণ্ঠ রুদ্ধ করা। এই জিজ্ঞাসাই জগতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কারণ হয়েছে। যদি গ্যালিলিও বাইবেলের কথানুসারে পৃথিবীকে চেপ্টা বলে মেনে নিতেন তা হলে

পৃথিবী গোল বলে তার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হয়ে যেত। সূর্যের গতি সম্পর্কে বাইবেলের কথাকে যদি কেপলার সাহেব অভ্রান্ত বলে স্বীকার করতেন, তাহলে পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে এ বিষয়ে তার তিনটি সূত্রকে আবিষ্কার করতে পারতেন কি? গ্রন্থকে স্বত্বঃপ্রমাণ মানলে নিউটন তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করতে পারতেন না এবং আইনষ্টাইন এর সংশোধক আপেক্ষিকতার মহান সিদ্ধান্তকে আবিষ্কার করতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে জগতে যা কিছু বিদ্যা এবং সভ্যতা সম্বন্ধীয় প্রগতি হয়েছে তা গ্রন্থকে স্বত্বঃপ্রমাণ বলে গ্রহণ না করার ফলেই সম্ভব হয়েছে। ব্যবহার জগতেই বা কোন মানুষ তার ধর্মগ্রন্থকে সত্যরূপে গ্রহণ করে? গ্রন্থ সমকালীন প্রথা, অন্ধবিশ্বাস এবং অজ্ঞতার সংস্কারে আবদ্ধ থাকে। এটি সমকালীন ধার্মিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের পরিপোষক মাত্র।

হাজার হাজার বৎসরের পর এই সকল কথা মৃতবৎ, কিন্তু তা হলেও যেন মৃতকে আবার আলিঙ্গন করতে চায়। সেন্ট পলের সময় মেয়েদের মাথা ঢাকা সে সময়ের একটা ফ্যাশনের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু এই কথা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হওয়াতে আজও ইউরোপের গীর্জায় বা আদালতে শপথ বাক্য পাঠ করার সময় মেয়েদের টুপি পড়তে বাধ্য করা হয়, কিন্তু অন্যান্য স্থানে সমাজ এটির আবশ্যকতা বুঝতে চায় না।

গ্রন্থকে প্রমাণ বলে স্বীকার করতে হলে এটির কর্তাকে সর্বজ্ঞ বলে মানতে হবে-সকল দেশ, সকল কাল এবং সকল বস্তু সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ। আর যদি কোন সর্বজ্ঞ আমার জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বে আমার দ্বারা কৃত ভালমন্দ সকল কর্মকে জেনে থাকেন, তাহলে আজও আমি সেরূপ ভালমন্দ কর্ম করতে বাধ্য হব, তা না হলে সর্বজ্ঞতা মিথ্যা হয়ে যাবে। তা ছাড়া মানুষ এরূপ সর্বজ্ঞের হাতে কাঠের পুতুলমাত্র নয় কি? আর কাঠের পুতুলের নিজের জন্য ভালমন্দ কাজ বেছে নেয়ার এবং করার কি অধিকার? তাহলে এরূপ ধর্মগ্রন্থ এবং এটিতে শিক্ষাসমূহের বা প্রয়োজন কি?

পরিশুদ্ধ এবং মুক্ত হওয়ার জন্য কর্ম করাতে মানুষের স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। কর্মের স্বাধীনতার জন্য বুদ্ধি-বিবেকের স্বাধীনতা প্রয়োজন। বুদ্ধি-স্বাধীনতার জন্য কোন গ্রন্থের পরাধীন না হওয়াই আবশ্যক। বস্তুতঃ কোন গ্রন্থের প্রামাণিকতা নির্ভর করে এটির বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞানের

উপর, বুদ্ধিমত্তার প্রামাণিকতা গ্রন্থের উপর নির্ভর করে না। উক্ত তিন প্রকার অস্বীকারাত্মক কথা বৌদ্ধ ধর্মে স্বীকৃত।

৪) জীবন প্রবাহের অস্তিত্বকে এই দেহের পূর্বে এবং পশ্চাতে স্বীকার্য

শিশুর জন্মের সঙ্গে এটির আরম্ভ হয়। শিশু কি? দেহ ও মনের সমষ্টি। দেহও কোন এক যৌগিক পদার্থ নয়, বরং একইক্ষণে অসংখ্য অণুর সমষ্টিমাত্র। এই অণু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে, এবং এটির স্থানে এটির সমান অন্য অণু উৎপন্ন হয়ে থাকে। এভাবেই ক্ষণে ক্ষণে দেহে পরিবর্তন ঘটেই চলছে। কয়েক বৎসর পরে বস্তুতঃ সেই দেহ থাকে না। কিন্তু পরিবর্তন একই পরমাণু সমূহের দ্বারা হয় বলে আমরা বলে থাকি-এটি ঐ দেহটিই (ঐ পূর্বেরই দেহ)। দেহ সম্বন্ধে যে সত্য, তা মনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, পার্থক্য হচ্ছে এই যে মন হচ্ছে সূক্ষ্ম, এটির পরিবর্তনও সূক্ষ্ম, এবং পূর্বাপর রূপসমূহের জ্ঞানও সূক্ষ্ম-এজন্য এটির প্রভেদ উপলব্ধি করা কঠিন। আত্মা ও মন একই এবং আত্মা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে। একই "আমি" অন্য স্থানে এসেছি।

দেহ এবং মন (-আত্মা) উভয়ই পরিবর্তিত হচ্ছে। কোন এক মুহূর্তের বালকের জীবন বিচার করে দেখুন, এটি নিজের পূর্ব জীবণাংশের প্রভাবে প্রভাবিত। অ, আ, শিক্ষা হতে আরম্ভ করে মধ্যখানের ক্লাসমূহে যা শিক্ষা হয়, তা পূর্ববর্তী অবস্থারই পরিণাম। মধ্যখানে আমরা কোন এক কড়িকেও বাদ দিতে পারি না। এস এস সি পাস না করলে অনার্স পাস করা যায় কি? এরূপ কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত অটুট দেখা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যখন জীবন এত লম্বা সময় পর্যন্ত কার্য-কারণ সম্বন্ধের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং সেখানে কোন স্থিতি আকস্মিক নয়, তা হলের জীবনের প্রারম্ভেই তাতে কার্য-কারণ নিয়মকে অস্বীকার করে আমরা এটিকে আকস্মিক বলে মানছি না কি?

আকস্মিকতা কোন সিদ্ধান্ত নয়, কেননা এতে কার্য-কারণ নিয়মকেই অস্বীকার করা হয়। অথচ কার্য-কারণ নিয়ম ব্যতিরেকেই কোন কিছুকেই সিদ্ধ করা যায় না। যদি বলেন-মাতাপিতার দেহানুরূপ পুত্রের দেহকে জন্ম দেয়, সেরূপ তাদের মন সেরূপই পুত্রের মনের জন্ম দেয়, তাহলে এই কথা আংশিক সত্য হলেও সামগ্রিকভাবে সত্য নয়। যদি তা হত, তাহলে মন্দবুদ্ধির মাতা পিতার নিকট প্রভাবশালী পুত্র বা

পাণ্ডিত্যশালী মাতা পিতার নিকট মন্দবুদ্ধির পুত্রের জন্ম হত না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পন্ডিতের ছেলে মূর্খ হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান হয়, যদি আমরা জীবন প্রবাহকে এই দেহের একেবারে শুরু থেকে জানতে পারি। আবার তো আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যেক পূর্ব জীবন পরবর্তী জীবন নির্মাণ করে। যেমনি খনি থেকে সদ্য তুলে আনা লোহা, খাদহীন কাঁহা লোহা এবং অনেকবার ঠাণ্ডা এবং গরম করে নির্মিত পাকা লোহা-এই তিন প্রকারের লোহা। সংসারের মাত্রা কম বেশী অনুসারে লোহাও কম বেশী সংস্কৃত হয়েছে। প্রতিভাশালী বালকের বুদ্ধি পাকা লোহার মত বিচার অভ্যাসের দ্বারা সুসংস্কৃত। মানসিক অভ্যাসের যদিও স্মৃতিরূপে সর্বদা উপস্থিত থাকা অত্যাবশ্যক নয়, পরন্তু সে অনুসারে ন্যূনাধিক সংস্কৃত ত অনেক জরুরী। এই জন্যেও কলেজ ছাড়ার পরে বিগত কয়েক বৎসর ধরে পাঠ্য পুস্তকসমূহের পঠিত অনেক নিয়ম, সূত্র ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এটির অর্থ এই নয় যে সমস্ত অধ্যায়ের পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়। নতুন কলসে কিছুদিন রেখে বের করে আনা গব্যঘৃতের ন্যায়, ভুলে গেলেও যে বিদ্যা অধ্যয়ন সংস্কার মনের ভিতরে দাগ কেটে থাকে তাই হচ্ছে শিক্ষার ফল। কলেজ ছাড়ার পরে বহু বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, পঠিত বিষয় অনেক বিস্মৃত হয়েছে, কিন্তু মানুষের মানসিক সংস্কৃতি তার পূর্বেকার বিদ্যাভ্যাসকে যেমন প্রমাণিত করে, সেরূপ শৈশবে প্রকাশিত প্রতিভাকে কেন পূর্বের অভ্যাসের পরিণাম বলে স্বীকার করা হবে না? বস্তুতঃ রক্তের সম্পর্ক এবং পরিবেশ মানসিক শক্তির অতটা কারণ নয়, যতটা কারণ-এটির পূর্বের জীবন প্রবাহে খুঁজতে হবে। কারণ কতকগুলি অপৈতৃক গুণ মানুষের মধ্যে হামেশাই দেখা যায়, যেমন পান্ডিত্য-মূর্খতা, ভদ্রতা-নৃশংসতা ইত্যাদি। ধরা যাক, কোন তরুণ অনেক তপস্যা দ্বারা অধ্যয়ন করে উত্তমভাবে এম এ পাস করল, কিন্তু নিজের পরিশ্রমের পুরস্কার লাভের পূর্বে তার মৃত্যু হল। এখন, তার পরিশ্রম মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়ে গেল এটি মনে না করে যদি করা হয় যে সেই তরুণ মৃত্যুর পর এক প্রতিভাশালী শিশুরূপে জন্মগ্রহণ করে তাতে দোষ কোথায়?

মূর্খ মাতা-পিতার গৃহে গণিতজ্ঞ, সংগীতজ্ঞ শিশু দেখা যায় কি? এভাবে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব যে, আমাদের বর্তমান জীবন হচ্ছে

এক সুদীর্ঘ জীবন প্রবাহের মধ্যে ছোট একটি ধারাবিশেষ যার পূর্বকালীন প্রবাহ চিরকাল ধরে চলছে এবং পরকালীন প্রবাহ চিরকাল ধরে বর্তমান থাকবে। জীবন প্রবাহ এই বর্তমান শরীরের পূর্ব হতে চলছে এটির পরেও থাকবে-তা হলেও এটিকে অনাদি এবং অনন্ত বলা যায় না। এটির আরম্ভ তৃষ্ণা হতে এবং তৃষ্ণা ক্ষয়ের সঙ্গে এটির ক্ষয় হয়ে যায়।

জীবন প্রবাহকে এই শরীরের পূর্বে ও পরে স্বীকার করলেও আমরা অকর্মণ্য হতে অকর্মণ্য ব্যক্তিকেও ভাল হবার আশা দিতে পারি। কোন উচ্চাদর্শের জন্য, লোক, সমাজ বা অন্য ব্যক্তির উন্নতির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার লোকের সংখ্যাও অনেক পাওয়া যেতে পারে। মানুষ নিজের ভালমন্দ কর্মের ফল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে অন্যের অনিষ্ট করা হতে নিজেকে সংযত করতে পারে। সমাজের হিতের জন্য আত্মবলিদানের জন্য তৈরী থাকা এবং সমাজের অনিষ্ট করা হতে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা-এই উভয়ই মানুষকে ভাল মানুষ তৈরী করার পক্ষে সহায়ক। লোকোন্নতি বাস্তবিক এই উভয় চেষ্টার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এই শরীরকে আদি এবং অন্তিম বলে ধরা হয়, তাহলে মানুষের উন্নতির রাস্তা রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং অবনতির রাস্তা ত্বরান্বিত হবে।

বুদ্ধের শিক্ষা এবং দর্শন উপরিউক্ত চারি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথম তিনটি সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ ধর্মকে জগতের অন্যান্য ধর্ম থেকে পৃথক করেছে। এই তিন সিদ্ধান্ত ভৌতিকবাদ এবং বুদ্ধ-ধর্মে সমান। কিন্তু চতুর্থ সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জীবনপ্রবাহকে এই শরীরের মধ্যেই পরিসীমিত বলে স্বীকার না করা-ভৌতিকবাদ হতে পৃথক করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিকে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী করার এক সুন্দর উপায় যাকে বাদ দিলে কোন আদর্শবাদেরই কাজে পরিণত হওয়া দুষ্কর।

চারি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রথম তিনটি প্রকার মস্ত বড় পরাধীনতা হতে মানুষকে মুক্ত করে। চতুর্থটি মানুষকে আশাবাদী করে এবং শীল সদাচারের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করে। যেখানে এই চারি সিদ্ধান্তের একসাথে সম্মেলন তাই বুদ্ধের ধর্ম।

মনের প্রকৃতি এবং কাজ যেভাবে বৌদ্ধ ধর্মে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

ব্যক্তিকে ব্যাখ্যায় বৌদ্ধ ধর্মে মন এবং-এর প্রকৃতির সম্পর্কগুলো ঝাপসাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কার্য-কারণ সূত্র যেটি তাকে এখানে সেখানে দুঃখ দেয়ার জন্য দায়ী, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে এটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে ব্যক্তির মন এবং এর অযথাযথ কাজ যা অশুভ চিন্তা দ্বারা কলুষিত হয়। মনের বিশুদ্ধির দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না জন্ম-মৃত্যুর চক্রের বন্ধন থেকে ছিন্ন হতে পারছে, ততক্ষণ সে এই চক্রের শিকার হয়ে অগণিত জন্ম দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে, বৌদ্ধ ধর্মে নৈতিকতার পদ্ধতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে (নির্বাণ) নিয়ে যায়, মন সেখানে সুপ্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে এবং বুদ্ধের সমুদয় শিক্ষা মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত করা যায়। মন এবং এর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার দিক থেকে বিবেচনা করলে বৌদ্ধ ধর্মের মনোবিদ্যা এবং নৈতিকতার প্রকৃতি যা দেখা যায় তার চেয়ে বেশী বাস্তব হয়ে উঠে।

মন কি?

ব্যক্তিকে মন এবং শরীর এই দুইভাগে মৌলিক বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে (নাম-রূপ), মন এবং অন্যান্য মানসিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। পাঁচটি উপাদানে ব্যক্তিকে শ্রেণী করণ করা হয় যেমন রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান তা হচ্ছে কিছুটা সম্পূর্ণ এবং সেখানে বিজ্ঞান হচ্ছে মন যেখানে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার হচ্ছে মানসিক হেতু মনের কাজের সাথে যা সম্পর্কিত। আরেক ধরনের শ্রেণীকরণ আছে যাতে মানসিক কাজগুলো ইন্দ্রিয় অনুষদের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে। এইভাবে ব্যক্তিকে বারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ চোক, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক, এবং মন, ইন্দ্রিয় শক্তির সাথে সম্পর্কিত ছয় রকমের বিজ্ঞান এর সাথে যুক্ত আছে। এক্ষেত্রে মন ছয় গুণ হয় এভাবে বারগুণের শ্রেণীকরণ তৈরী হয় যাতে চক্ষুবিজ্ঞান, কর্ণবিজ্ঞান, ঘ্রাণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান এবং মনবিজ্ঞান যুক্ত থাকে।

মনের প্রকৃতি এবং কাজ

বিভিন্ন গ্রন্থে মনের বিভিন্ন কাজ এবং প্রকৃতিকে প্রকাশ করার মাধ্যমে মনের বিভিন্ন ব্যাপার সংরক্ষণ করা হয়েছে। মনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ বৈশিষ্ট্য এ নিবন্ধে প্রকাশ করা হল ঃ

- এটি আনন্দ, প্রসন্নতা (ক্রোধের উপশমের জন্য কিছু করা) এবং কেউকে বুঝাতে যে ক্ষমতা লাগে তা প্রদান করে (আরাধেতি)।
- এটি সামনে এগিয়ে নেয়, ধরে রাখে, উঠিয়ে রাখে, নিষ্ক্রান্ত করে, প্রসারিত করে এবং এর লক্ষ্যের সাথে বলিষ্টভাবে যুক্ত রাখে (পগ্‌গন্‌হতি্)।
- এটি ত্যাগ করে, সংগ্রহ করে, এক সাথে করে, জড়ো করে, সংযোগ করে, আয়োজন করে, বিভিন্ন উপায়ে ফোকাস এবং একীভূত করে (উপসংহারহতি্)।
- এটি বাঁকায়, দিক নির্দেশ করে এবং কার্যে পরিণত করে (নমতি্)।
- এটি সম্মুখে লাফায়, ছোটাছুটি করে, লক্ষ্যকে তুলে নিয়ে আহলাদিত হয় (পক্‌খন্দতি্, পসিদতি্, সনতিট্‌ঠতি)।
- এটি শান্ত ও নীরব রাখে (পস্‌সন্ততি্)।
- এটি দ্বিধান্বিত করে, বিশৃঙ্খলা করে, ভেঙ্গে-চুরে দেয়, উদ্বিগ্ন করে এবং আপসেট করে (মথেতি্)।
- এটি নাড়ায়, অস্থিত করে, তরঙ্গায়িত করে এবং সন্দেহ পোষণ করে (বিকমপতি্)।
- এটি ইতস্ততঃ করে, বাঁধা দেয়, দমন করে, নিষিদ্ধ করে (নিবারেতি্)।
- এটি আঘাত, খুন, ধ্বংস এবং নিস্তেজ করতে পারে (পহঞ্‌ঞতি্)।
- এটি লক্ষ্য বস্তুর সাথে আটকে থাকে এবং বন্ধন সৃষ্টি করে (সজ্জতি, গয্‌হতি, বজ্জতি্)।
- এটি কলুষিত করে, দুর্নীতি করে এবং নিস্প্রভ করে (বযাসিঞ্চতি্)।

- এটি জড়িত করে, আকর্ষিত করে, এর লক্ষ্যবস্তুর সাথে শারীরিক এবং মানসিক সম্পর্কে যুক্ত থাকে, সাধ মেটাতেও প্রবৃত্ত থাকে (অধিমুচ্চতি্)।

মনের বিভিন্নমুখী প্রকৃতি ও কাজের পূর্ববর্তী সংজ্ঞানুযায়ী, বৌদ্ধ ধর্মে এর তিনটি কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

১) অনুভব

২) স্বাভাবিক

৩) বোধ

মনের অনুভবের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝায় অনুভূতির কাজ যা মনকে পূর্ণ রাখে। মনের স্বাভাবিক কাজ হচ্ছে কিছু করা, ইচ্ছাপোষণ করা, উদ্যমী রাখা ও আশা করা এবং বোধ ব্যাপারটুকু জানার, বিশ্বাসের, যুক্তির এবং হৃদয়ঙ্গমের কাজ করে। যেহেতু এই কাজগুলো পৃথকযোগ্য নয় এবং ব্যক্তিগতভাবে স্বত্বঃস্ফুর্ত কাজ ও আন্তকাজের মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়, এতে মানসিক ক্রিয়াগুলো জটিল, প্রভাবিত এবং সূক্ষ্ম হয়ে উঠে। মনের প্রতিশব্দ হিসেবে চিত্ত, মন, বিজ্ঞান, মনস, হৃদয় ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে পালি শাস্ত্রে, প্রথম তিনটি মনকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। চিত্ত গঠিত হয় 'চিন্তা' করা দিয়ে, মনের সাথে 'মনস' এবং বিজ্ঞান গঠিত হয় 'জানা' দিয়ে। যেহেতু হৃদয়কে মনের আসনরূপে বিবেচনা করা হয় চেতনা অথবা মনকে হৃদয় শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়। অধিকন্তু চিত্ত, মন এবং বিজ্ঞান টার্মগুলোকে সমার্থক হিসেবে দেখা হয়। বিভিন্ন দৃষ্টান্তে মনের অনুভব, হৃদয়াঙ্গম, স্বাভাবিক, বোধ করার কাজগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়জ, উপলব্ধিজাত যৌক্তিক, বিষয়কেন্দ্রিক মানসিক কাজগুলো এর অন্ত র্ভূক্ত। বৌদ্ধ ধর্মের শুরুর দিকে মনের নানা দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ, মনস্তাত্তিক, নৈতিক এবং স্বাভাবিক দিক থেকে আলোচিত হত। পালিতে এর বিভিন্ন কাজ গুলোকে কিছু সংখ্যক ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করার একটা প্রয়াস লক্ষ্যণীয়ঃ 'জানা'। এভাবে জানার কাজকে বুঝার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়াগত গঠন ব্যবহৃত হয়েছে।

জানা
পার্থক্যের সাথে জানা
উপলব্ধি করার সাথে জানা
জ্ঞানের সাথে জানা
বোধের সাথে জানা
অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধির সাথে জানা
শেখা অথবা আহরণ করা
স্বীকার করা অথবা অনুমোদন করা।

মনের ভিত্তিতে ধর্মপদ

শরীর ছাড়া মনের অস্তিত্বকে বৌদ্ধ ধর্মে কখনো স্বীকার করা হয় না। এটি শরীরের গুহায় অবস্থিত। মনের প্রকৃতি, কাজ এবং নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের ভিত্তিতে ধর্মপদে বলা আছে ঃ

"দূরে অগ্রসর হওয়া, একাকী বিচরণ করা অশরীর, (শরীর) গুহায় বাস, হচ্ছে মন। যারা এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে তারাই মারের বন্ধন হতে মুক্ত।"

ধর্মপদের চিত্তবর্গের সবখানে ব্যক্তি পর্যায়ে এটি যে প্রকৃতি, কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা আছে।

"মন হচ্ছে চঞ্চল, প্রায়ই পরিবর্তনশীল, নিয়ন্ত্রণ ও পাহাড়া দিতে কষ্টসাধ্য।"

"একটি মাছকে পানি থেকে তুলে, মাটিতে ছুঁড়ে মারলে যেরূপ হয় এমনকি মনও সেভাবে ধড়ফড় করে।"

"মন নজরে রাখা কষ্টকর, বেগবান, যেখানে খুশি ফুরফুরিয়ে চলা স্বভাবের।"

"মনকে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, চরম সূক্ষ্ম।"

"মন (সকল ভাল ও খারাপ) মানসিক অবস্থার অগ্রদূত।"

"মনই প্রধান; মন তাদেরই তৈরী।"

মন শর্ত সাপেক্ষ এবং আপেক্ষিক

উপনিষদে, মনকে আত্মা বলে বিবেচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে 'নিরাশ্রয় বিজ্ঞান'। সাধারণত পশ্চিমা চিন্তাতেও, মনকে আত্মা হিসেবে ধরা হয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম মতে জোরের সাথে উক্ত যে, এটি আত্মা নয় এবং আত্মা সংশ্লিষ্ট কোন বস্তুও নয়। বুদ্ধের উপদেশে বৌদ্ধ ধর্মের মনস্তত্ত্ব পাওয়া যায় এবং পরবর্তী অভিধর্মে গবেষণামূলক আলোচনাগ্রন্থে গবেষণা করে পাওয়া যায় এটি 'আত্মা' ছাড়া মনোবিজ্ঞান। এর শর্তসাপেক্ষে কারণগুলোকে বৌদ্ধ শাস্ত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। মহাতণহাসঙ্খয সুত্রে বিশেষ উদাহরণ আছে যেখানে বুদ্ধ এই মতকে অসত্য বলে প্রতীয়মান করেছেন যে একই সংজ্ঞা একজনের কাজের ভালমন্দ ফল নিয়ে জন্ম-জন্মান্তরে ঘুরে বেড়ায়। যখন শ্রদ্ধেয় সাতি যিনি এই মতাবলম্বী ছিলেন বুদ্ধ তাকে তার সংজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি এবং একজনের কাজ ও সংজ্ঞার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে বললেন, তিনি বললেন ঃ

"শ্রদ্ধেয় ভগবান, এইটি হচ্ছে এই যে এখানে-সেখানে কথা বলছি, অনুভব করছি এবং উপলব্ধি করছি তা ভাল এবং খারাপ কাজের ফল।"

"অমোঘ মানব, তুমি কারো কাছ থেকে কখনো আমাকে এভাবে ধর্ম শিক্ষা দিতে শুনেছ?" অমোঘ মানব, অনেক দেশনায় আমি কি বলিনি যে সংজ্ঞা কার্য-কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয়, শর্তবিহীনভাবে কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় কি? কিন্তু তুমি, অমোঘ মানব, আমাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছ তোমাদের ভুল উপলব্ধি দিয়ে এবং নিজেদেরকে আহত করেছ ও প্রচুর অশুভ ফল বাড়াচ্ছ; কারণ এটি তোমাদেরকে দীর্ঘদিনের জন্য দুঃখে পতিত করবে।"

এরপরে যখন ভিক্ষুগণকে প্রশ্ন করলেন যে তারা সংজ্ঞার কার্য-কারণের প্রকৃতির সঠিকভাবে গ্রহণ করেছে কি না, ভিক্ষুগণ প্রত্যুত্তর করলেন ঃ "বুদ্ধের অনেক দেশনায় দেশিত হয়েছে যে সংজ্ঞা কার্য-কারণ থেকে উৎপন্ন হয়, কারণ শর্ত ছাড়া কোন সংজ্ঞার উৎপত্তি হয় না।"

অভিধর্মে মনের বিভাগ

যেহেতু মন বৌদ্ধদের মন উন্নতির শিক্ষার কার্যক্রমে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে, অভিধর্মে, মনকে একত্রিশ লোকভূমি অনুসারে ঊননব্বই বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ

১) কামভূমির সাথে চুয়াল্লিশ প্রকারের সংজ্ঞা বিদ্যমান (কামাবচর)।

২) রূপভূমির সাথে পনের রকমের সংজ্ঞা বিদ্যমান (রূপাবচর)।

৩) অরূপভূমিতে বার প্রকারের সংজ্ঞা বিদ্যমান (অরূপাবচর)।

৪) লোকুত্তরে আট রকমের সংজ্ঞা বিদ্যমান (লোকুত্তর)।

অভিধর্মে মন বা সংজ্ঞাকে বুঝানোর জন্য চিত্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেটি সচরাচর মনের জীবন্ত দৃষ্টিরূপকে নিয়ে আলোচনা করে। এই প্রকারভেদ আলো ফেলে যে প্রকারভেদের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধভাবে নৈতিক। বৌদ্ধতত্ত্বের অনুসারে একত্রিশ লোকভূমি, যেটিকে প্রায়ই পশ্চিমা পণ্ডিতদের দ্বারা বৌদ্ধ বিশ্বব্রহ্মান্ড বলা হয়। এখনো শ্রেণীবিভাগের গুরুত্ব বিদ্যমান ; যেটিই বুদ্ধের কর্ম, পুনঃর্জন্ম, ধ্যানরস এবং পরম আশীর্বাদ নির্বাণের উপলব্ধির উপর শিক্ষাপদগুলোকে আলো দান করবে।

"শরনির্মাতা তীরের ফলাকে যেরকম সোজা করে, জ্ঞানী ব্যক্তি শিহরিত, আলোড়িত, দুর্দমনীয় ও অনিয়ন্ত্রিত মনকে সেইরূপ দমন করে।"

-ধর্মপদ, ৩৩।

পঞ্চশীল

সংসার শব্দের প্রকৃত অর্থ-জীবরূপে আবির্ভূত হওয়া; তথা জীবন যাত্রার প্রণালী ক্রমাগত উদ্ভুত হওয়া। সরাসরি ইন্দ্রিয় গোচর বস্তুর ব্যাপারে-সমস্ত জীব মৃত্যুর পর ক্রমাগত একের পর অন্য স্তরে জীবন ধারণ করে। যেমন, ব্রহ্মলোক, দেবলোক, মনুষ্যলোক, পশুপক্ষী, প্রেতলোক, অসুরলোক প্রভৃতির যেকোন ভুবনে জন্মধারণ করে। লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে বলতে গেলে-যদি মানুষ মৃত্যুর পর মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে তাতে বিশেষ লাভ-ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। যদি দেব ও ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে বা দেহ ধারণ করে, তাতে যথেষ্ট লাভ অনুমিত হয়। যদি পশু, পক্ষী, প্রেত, অসুর প্রভৃতি দুর্গতি স্থানে দেহ ধারণ করে, তবে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারা এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, দেবলোক, ব্রহ্মলোকে দেহ ধারণের কথা দূরে থাকুক পুনরায় মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশু, পক্ষী, প্রেত ও অসুরলোকে ধর্ম শ্রবণের সুযোগ পায় না। ধর্ম শ্রবণের সুযোগ কদাচিৎ দৃষ্ট হলেও ধর্ম বুঝতে পারে না। চতুর্অপায় (পশুপক্ষী, প্রেত, অসুর, নিরয়) হতে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। ভিক্ষু, শ্রমণ, গার্হস্থ্য ধর্মাবলম্বী (মানুষ) প্রভৃতি যারা হঠকারিতার সাথে শীল পালন করে, তারাও ত্রুটি, বিচ্যুতির কারণে চারি অপায়ে দেহ ধারণ করতে বাধ্য হয়। কারণ, (১) তারা পঞ্চশীল কি তা জানে না, (২) পঞ্চশীল জানলেও যথাযথ পালনে অপারগ। (৩) তারা স্বভাবতঃ শীল পালনে অশ্রদ্ধ (অনভ্যস্ত)। এই সমস্ত জীব মৃত্যুর পর অপায়ে গমন করতে পারে। অতএব প্রত্যেকের পঞ্চশীল পালনে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত, যাথে পঞ্চশীল পালনজনিত পুণ্যের প্রভাবে অন্ততঃ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারে। পঞ্চশীল কি? (১) প্রাণী হত্যা বিরতি, (২) অদানীয় বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ (চৌর্য) বিরতি, (৩) ব্যভিচার বা পরদার সেবা বিরতি, (৪) মিথ্যা বাক্য (ভেদ বাক্য, কর্কশ বাক্য ও বৃথা বাক্য) বিরতি, (৫) সুরা, মৈরয় ইত্যাদি নেশা পান বিরতি। উপরোক্ত পঞ্চশীলের মধ্যে চতুর্থ শীল বাক্যজনিত কর্ম (যা কায় কর্মের অন্তর্ভূক্ত) যথাযথ অনুশীলনে অনর্থক বাক্য ব্যয় ও অপকর্ম হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

পঞ্চশীলের পরিবর্তন সাধক নাম

সুপ্রসিদ্ধ ত্রিপিটক ও চুরাশি সহস্র ধর্ম বাণীতে পঞ্চশীলকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। শীল দু'প্রকার ঃ (১) চরিত্ত শীল ও (২) বারিত্ত শীল। চরিত্ত শীল পালন নির্দিষ্ট অনুশীলন ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক উপদিষ্ট হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ত্রয়োদশ প্রকার ধূতাঙ্গ চরিত্ত শীলের অন্তর্গত। চরিত্ত শীলের ব্যাপারে-অনুশীলন ক্রমে শীলগুণ অধিকার করতে; অন্যথা শীল ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বারিত্ত শীল-সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা। এটি শুধু পরিকল্পনা নয়। বারিত্ত শীলের লক্ষণ ঃ-এদের অনুশীলন ও দুঃশীলতা বর্জনকরতঃ গুণাবলী অনুশরণ তথা পুণ্য সঞ্চয় করতে হয়। এদের অনব্যস্ততায় এবং দুঃশীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে পাপ সঞ্চয় হয়। এটি "শীল নির্দেশ অধ্যায়, বিশুদ্ধমার্গ অর্থকথায়" প্রদর্শিত হয়েছে।

পঞ্চশীল অনুশীলন

পঞ্চশীল অনুশীলনের (প্রারম্ভিক বা) প্রথম শীল পাণাতিপাত বেরমণী (প্রাণীহত্যা বিরতি), কার্যকারণ, কর্ম, ক্রিয়া, আচরণ এবং বাক্যকে সংযত করে। সেজন্যে এগুলোকে নৈতিক আচরণ বা শীল নামে পরিচিত। এদের এক এক দফায় গণনাকরতঃ পাঁচ দফায় সর্বমোট পঞ্চশীল নামে অভিহিত করা হয়। এটি তুণ্ডিলা জাতক, জাতক অথকথা, অথসালিনী অথকথা, সন্মোহ বিনোদিনী অথকথা, সগত বগ্গ সংযুক্ত অথকথা, বুদ্ধবংস, পালি সংস্করণ নন্দ থেরী অপদান এবং পঞ্চশীল সমাদানীয় থের অপদান প্রভৃতিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

পঞ্চশীল শিক্ষাপদ

পাণাতিপাতা বেরমণী (প্রাণীহত্যা বিরতি), প্রথম শীল অনুক্রমে পঞ্চশিক্ষাপদ নৈতিক আচরণ সমন্বয়ে অনুশীলন বিশেষ উপযোগী ও মঙ্গলপ্রদ। এটি দীর্ঘ নিকায় সদীতি সূত্র, পথিক বগ্গ পালি সংস্করণ, সন্মোহ বিনোদিনী অথকথা, বিশুদ্ধিমার্গ অথকথা, শিক্ষাপদ বিভঙ্গ খুদ্দক নিকায় অভিধর্ম সংস্করণে নির্দেশিত হয়েছে।

চক্কবত্তি (চক্রবর্ত্তী) ধম্মসৎ

বিশ্ব শাসকগণ বিশ্ব শাসনের অভিপ্রায়ে পঞ্চশীলের বহির্ভূত কোন স্বতন্ত্র আইন প্রণয়ন করেনি। এইরূপে পঞ্চশীল প্রথাকে বিশ্বশাসকদের অনুশাসনলিপিও বলা চলে। অতএব চক্রবর্ত্তী ধম্মসৎকে বিশ্বশাসকের নীতিগত আইন বলে। এটি দীর্ঘ নিকায়ের মহা সুদর্শন সুত্র এবং পথিক বর্গ চক্রবর্ত্তী সূত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

গুরুধর্ম

যেহেতু পঞ্চশীল পালন জনসাধারণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণীয় ও শ্রদ্ধা সম্পদরূপে অভিজ্ঞাত, এই কারণে এটিকে গুরুধর্ম বলে। টিক নিপাত, গুরুধর্ম জাতক অত্থকথা দ্রষ্টব্য। সিংহলী ও থাইল্যান্ডের ভাষায় গুরুধর্ম জাতককে কুরুধর্ম জাতক বলে অভিহিত করা হয়।

অরিয়ধম্ম (আর্যধর্ম)

যেহেতু পঞ্চশীল আর্য ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরা অনুশীলন করেন, এই কারণে এটিকে অরিয়ধম্ম বা আর্যধর্ম বলা হয়।

গহত্ত (গার্হস্থ্য) শীল

পঞ্চশীল পালন সংসারী লোক বা গৃহীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হয়। এটি "শীল নির্দেশ; বিশুদ্ধি মগ্গ অত্থকথায়" বর্ণিত হয়েছে।

নিচ্চা শীল

জনসাধারণের সতর্কতার সাথে পঞ্চশীল অনুশীলন করা বিধেয় এবং নিয়মিতভাবে নিয়ম-নিষ্ঠাদি প্রতিপালন করা অভিপ্রেত। এই কারণে বিশুদ্ধি মগ্গ অত্থকথায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অরিয়কান্ত

পঞ্চশীল অনুগামী ধার্মিক ও পবিত্র পুরুষগণ পঞ্চশীলের গুণাগুণ (শীল সংরক্ষণের গুণ বা পুণ্য এবং অরক্ষণে অগুণ বা পাপ) উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সুতরাং তাদেরকে অরিয়কান্ত বলা হয়।

পঞ্চশীল পালনের উপকারিতা (সংক্ষিপ্ত)

যিনি অবিচলিত ও নিয়মিতভাবে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তিনি নিম্নোক্ত ফলসমূহ লাভ করতে পারেন ঃ-

১) তিনি বিস্তর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারি হতে পারেন।

২) তিনি যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন।

৩) তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও সৎসাহসের সাথে সভা সমিতিতে যোগদান করতে পারেন।

৪) তিনি মৃত্যুর সময়ে শান্তি ও উপেক্ষা সহগত চিত্তে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময়ে অচৈতন্য ও জ্ঞানহারা হন না।

৫) মৃত্যুর পর তারা দেবলোকে দেহধারণ করেন। এটি অঙ্গুত্তর নিকায় পঞ্চক নিপাত, পাটলিগ্রাম বখ্গু, ভেসজ্জক খন্দ, বিনয় মহাবগ্গ ও পাটলীগামীয় সূত্র, খুদ্দক নিদান উদান পালি সংস্করণ হতে উদ্ধৃত।

অঙ্গুত্তর নিকায় বের সূত্রে বলা হয়েছে যে ঃ-যারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পঞ্চশীল পালন করেন তারা নৈতিক আচরণের ধারক ও বাহক রূপে পরিগণিত হন এবং শীলবান নামে পরিচিত হন। তারা মৃত্যুর পর ষষ্ঠ দেবলোকের যে কোন স্তরে কিংবা মনুষ্যলোকে দেহ ধারণ করতে পারেন।

অঙ্গুত্তর নিকায় শিক্ষাপদ পেয়াল পঞ্চক নিপাতে বলা হয়েছে ঃ-যারা দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পঞ্চশীল পালন করেন, তারা মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হবেন।

পঞ্চশীল পালনের উপকারিতা (বিশদ বর্ণনা)

ক) পাণাতিপাতা বেরমণীর (প্রাণীহত্যা বিরতির) মঙ্গল সাধক পরিণতি বা সুফলসমূহ ঃ-

১) প্রাকৃতিক বা দৈহিক - পদার্থবিদ্যাগত কোন খুঁত, অপূর্ণতা বা বিকলাঙ্গতা থাকে না।

২) দৈহিক গঠন সমানুপাতে বিন্যস্ত থাকে।

৩) দ্রুত গতিশীল হন।

৪) পদদ্বয় সমানুপাতিক হয়।

৫) সুন্দর চেহারা যুক্ত হন।

৬) ভদ্র হন।

৭) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হন।
৮) সৎ সাহসী হন।
৯) বলশালী হন।
১০) সুভাষিত ও সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।
১১) জনসাধারণের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র হন।
১২) সম্মিলিত মনোভাবসম্পন্ন হন; অর্থাৎ জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে পারেন।
১৩) জঘন্য ও পাশবিক দেহধারী হন না।
১৪) অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন না।
১৫) অপরের অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন না।
১৬) শরীরের বর্ণ সুন্দর, স্বর্ণবর্ণ হয়।
১৮) রোগমুক্ত থাকেন।
১৯) শোক ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না।
২০) দীর্ঘায়ু হয়।

খ) আদিন্নাদানা বেরমণীর (অদত্ত বস্তুর গ্রহণ বিরতির) মঙ্গল সাধক পরিণতি বা সুফল সমূহ ঃ-

১) বহু বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হন।
২) বর্ণনাতীত ধন সম্পত্তির অধিকারী হন।
৩) ধন সম্পত্তির অবনতি ঘটে না।
৪) দ্রুত ইচ্ছানুযায়ী সম্পদ লাভ হয়।
৫) অর্জিত সম্পদ অপহৃত হয় না বা ক্ষতিকর উপাদানে বিনষ্ট হয় না।
৬) সম্মানজনক ও সমৃদ্ধশালী হন।
৭) সর্বত্র নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম হন।
৮) কোন কিছুর অভাববোধ করেন না।
৯) শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করেন।

গ) কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণীর (ব্যভিচার বা পরদার সেবা বিরতির) মঙ্গল সাধক পরিণতি বা সুফল ঃ-

১) কোন শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হন না।
২) জনসাধারণের স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন হন।
৩) খাদ্য, ভোজ্য, বস্ত্র অলংকারাদি যথাযোগ্য পেতে সক্ষম হন।

৪) শান্তিতে নিদ্রা হয়।
৫) শান্তিপূর্ণ ওস স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জাগ্রত হন।
৬) চর্তুঅপায়ে পতিত হন না (তীর্যক, প্রেত, নরক, অসুর)।
৭) নপুংশক হন না।
৮) সহজে উত্তেজনাশীল হন না।
৯) ন্যায়পরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য ও সমদর্শী হন।
১০) কর্মক্ষম ও সুখী চেহারা যুক্ত হন।
১১) স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তোষ লাভ করেন।
১২) দৈহিক অপূর্ণ ও বিকলাঙ্গতা থাকে না।
১৩) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যপূর্ণ চেহারা যুক্ত হন।
১৪) অস্নিগ্ধ বা নিঃসন্দেহ হন।
১৫) দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ ও উদ্বিগ্ন হন না।
১৬) সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করেন।
১৭) কোন প্রকারের বিপদ, আশংকা, ভয়-ভীতি থাকে না।
১৮) সতত প্রিয় সংযোগ স্থাপন হয়।

ঘ) মুসাবাদা বেরমণীর (মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা বাক্য বিরতির) মঙ্গল সাধক পরিণতি বা সুফল ঃ-

১) প্রফুল্ল ও দীপ্তিশীল চেহারা যুক্ত হন।
২) নির্দোষ ও সুভাষিত বাক্য প্রয়োগ করতে সক্ষম হন।
৩) শ্বেত ও সমানুপাতিক দন্ত বিশিষ্ট হন।
৪) অত্যধিক মোটা হন না।
৫) অত্যধিক সূক্ষ্মও হন না।
৬) অত্যধিক লমবাও হন না।
৭) অত্যধিক খাটো হন না।
৮) কোমল দেহধারী হন।
৯) পদ্মা পলাশযুক্ত সুরভিত মুখগহ্বর হয়।
১০) জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হন।
১১) অর্থপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ভাষাবিদ হন।
১২) পদ্ম পাঁপড়ির সদৃশ কোমল, রক্তাভ জিহ্বা হয়।
১৩) ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতা অনুভূত হয় না।

১৪) প্রচন্ড ধাক্কা ও বিপদসংকেত হতে মুক্ত থাকেন।

ঙ) সুরা, মেরয়, মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণীর (সুরা, মদ্য, আফিন, গাঁজা ইত্যাদি সেবন বিরতির) মঙ্গল সাধক পরিণতি বা সুফল ঃ-

১) যথাসময়ে কার্য সম্পাদনে মনোযোগী হন।

২) বুদ্ধিমত্তা ও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন।

৩) সতত সতর্ক থাকেন।

৪) সর্ব প্রকার আকস্মিক ঘটনায় সর্বপ্রথমে অভিযান করেন (অগ্রসর হন)।

৫) পরিশ্রমী হন।

৬) বোবা ও বধির হন না।

৭) উন্মত্ত হন না।

৮) প্রচন্ড ধাক্কা ও বিপদসংকেত থেকে মুক্ত থাকেন।

৯) বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন না।

১০) অন্যের প্রতি ঘৃণ্য মনোবৃত্তি পোষণ করেন না।

১১) ঈর্ষা ও হিংসাবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকেন।

১২) সর্বদা সত্য বাক্য প্রয়োগ করেন।

১৩) পিশুন, ভেদ, কর্কশ ও অযথা বাক্য প্রয়োগ করেন না।

১৪) কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যত্নবান হন।

১৫) প্রত্যুপকার করতে সমর্থ হন।

১৬) উদার ও দানশীল হন।

১৭) শীলবান হন।

১৮) ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক হন।

১৯) ক্রোধান্বিত হন না।

২০) বিনয়ী ও অন্যায় কর্মে ভয়শীল হন।

২১) সত্য বিশ্বাসী হন।

২২) উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হন।

২৩) জ্ঞানী হন।

২৪) সুবিধা, অসুবিধা ব্যাপারে বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন হন।

"ইতি বুত্তক" অত্থকথা, তৃতীয় নিপাত, পঞ্চমসূত্র হতে উদ্ধৃত।

পঞ্চশীল ভঙ্গ বা লংঘনের পরিণতি বা কুফল (সংক্ষিপ্ত)

যারা পঞ্চশীল ভঙ্গ করে তারা নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকারের শাস্তি ভোগ বা যন্ত্রণাদি ভোগ করে ঃ-

১) তাদের বহু বিষয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয় ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২) তারা কুখ্যাত হয় এবং সর্বত্র তাদের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে।

৩) জনসাধারণের নিকট লজ্জিত ও ভীত থাকে।

৪) মৃত্যু সময়ে তারা মূর্চ্ছা ও জ্ঞান শূন্য হয়।

৫) মৃত্যুর পরবর্তী মুহূর্তে তারা চর্তুঅপায়ের যেকোন স্তরে দেহ ধারণ করে।

এটি অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চনিপাত ও পাটলিগ্রাম বত্থু ভেসজ্জখন্দ, বিনয় মহাবগ্গ, পাটলিগামীয় সূত্র, উদান, পালি সংস্করণ হতে উদ্ধৃত।

পঞ্চশীল ভঙ্গ বা লংঘনের পরিণতি বা কুফল (বিশদ বর্ণনা)

ক) পাণাতিপাতা-প্রাণীহত্যা করার কুফল ঃ যে প্রাণী হত্যা করে সে চর্তুঅপায়ে (তীর্যক, প্রেত, নরক, অসুর) প্রভৃতির যেকোন দুর্গতির স্থানে জন্ম গ্রহণ করে।

খ) আদিন্নাদানা বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ বা চুরি করার কুফল ঃ অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ বা নষ্ট করলে, মৃত্যুর পর চর্তুঅপায়ে দেহ ধারণ করে। যদিও সে সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্যলোকে জন্মধারণ করে তার ধন সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। এমনকি কিঞ্চিৎ সম্পদ ও অবশিষ্ট থাকে না।

গ) কামেসু মিচ্ছাচারা-ব্যভিচার বা পরদার সেবার কুফল ঃ যে ব্যভিচার বা পরদার সেবা করে, মৃত্যুর পর সে চর্তুঅপায়ে যে কোন দুর্গতি স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। যে কোন পুণ্য মনুষ্যলোকে দেহ ধারণ করলেও সে বহু শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ঘ) মুসাবাদা (মিথ্যা, ভেদ, কটু ও বৃথা) বাক্য প্রয়োগের পরিণতি বা কুফল ঃ যে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করে, সে যারপরনাই দুঃখ ভোগ করে এবং চারি দুর্গতি স্থানে যে কোন স্থানে দেহ ধারণ করে, যে কোন পুণ্য প্রভাবে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করলেও নানা প্রকার

অন্যায় অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

ঙ) মদ্য (সুরা), আফিন, গাঁজা ইত্যাদি সেবনের পরিণতি বা কুফল ঃ যে সুরা পান করে মৃত্যুর পর নরক স্থানে জন্মগ্রহণ করে, ভাগ্যক্রমে মনুষ্যলোকে দেহ ধারণ করলেও উন্মত্ততা (পাগলামি) ও কঠিন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়, কোন কোন সময় বোবা ও বধির হয়।

এটি অঙ্গুত্তর নিকায়, অট্‌ঠক নিপাত পালি গ্রন্থ, এবং দান বগ্‌গ, মনোরথ পুরণী আখ্যায়িকায় প্রদর্শিত হয়েছে।

পঞ্চশীল চারি স্রোতাপন্ন লক্ষণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যসূচক গুণ বা ধর্ম

বুদ্ধ বলেছিলেন, "ওহে ভিক্ষুগণ, যে পবিত্র ও মহিমান্বিত শিষ্য চারিগুণ বিশিষ্ট তিনিই স্রোতাপন্ন লক্ষণযুক্ত। স্রোতাপন্ন কখনো বর্তমান মার্গ হতে নিম্নে পতিত হয় না; বরং উর্দ্ধগামী হয়।-ভিক্ষুগণ! স্রোতাপন্ন গুণ কি কি?

১) বুদ্ধের গুণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, অবিচলিত, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অদম্য গুণ বিশিষ্ট।

২) ধর্মের গুণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, অবিচলিত, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অদম্য গুণ বিশিষ্ট।

৩) সংঘের গুণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, অবিচলিত, শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও অদম্য গুণ বিশিষ্ট।

৪) সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিয়মিত শীল পালন, যা জ্ঞানীগণের সম্পদ রূপে বিবেচিত হয় এবং মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে সমাধি চিত্ত উৎপন্ন করে অরিয়কান্ত গুণ বিশিষ্ট হন।

উপরোক্ত চারি লক্ষণযুক্ত মহিমান্বিতগণ স্রোতাপন্ন নামে অভিহিত হন। এটি স্রোতাপত্তি সংযুক্ত মহাবগ্‌গ, সংযুক্ত নিকায় হতে উদ্ধৃত।

অতএব আমাদের সকলেরই পূর্বকৃত দোষসমূহ সংশোধন করে অন্ততঃ পঞ্চশীল পালনে বিশেষ মনোযোগী হওয়া উচিত।

সব্বে সত্ত্বা সুখিতা হোন্তু

সকল জীব সুখী হোক।

সংকলক পরিচিতি

জুয়েল বড়ুয়া

বাবা ঃ অশোক কুমার বড়ুয়া
মা ঃ নিপু বড়ুয়া
গ্রাম ঃ শিলক
ডাকঘর ঃ শিলক
উপজেলা ঃ রাঙ্গুনীয়া
জেলা ঃ চট্টগ্রাম।
পড়াশোনা ঃ গণিত বিভাগ
শাহজালাল বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

প্রাপ্তি স্থান

- **আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী**
  পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।
  e- mail : bbbhikkhu@yahoo.com
  web : www.avbbp.20m.com

- **সিলেট বৌদ্ধ বিহার**
  আখালিয়া, নতুন বাজার, সিলেট।
  মোবাইল ঃ ০১৮২৩-১৩৭৫৬৬, ০১৯১১-৮৭৭৮৭৬

- **প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী**
  শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার
  মোগলটুলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
  ফোন ঃ ৭১৪২৮৩, মোবাইল ঃ ০১৭১২-৮৫২৭০৯
  e-mail: pb_academy@yahoo.com

- **পশ্চিম গহিরা শান্তিময় বিহার**
  ১নং ওর্য়াড, রাউজান পৌরসভা।
  মোবাইল ঃ ০১৮১৮-৯১৪১০৬

- **নালন্দা লাইব্রেরী**
  আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।